ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম

শিশুর বিকাশ ও শিখন

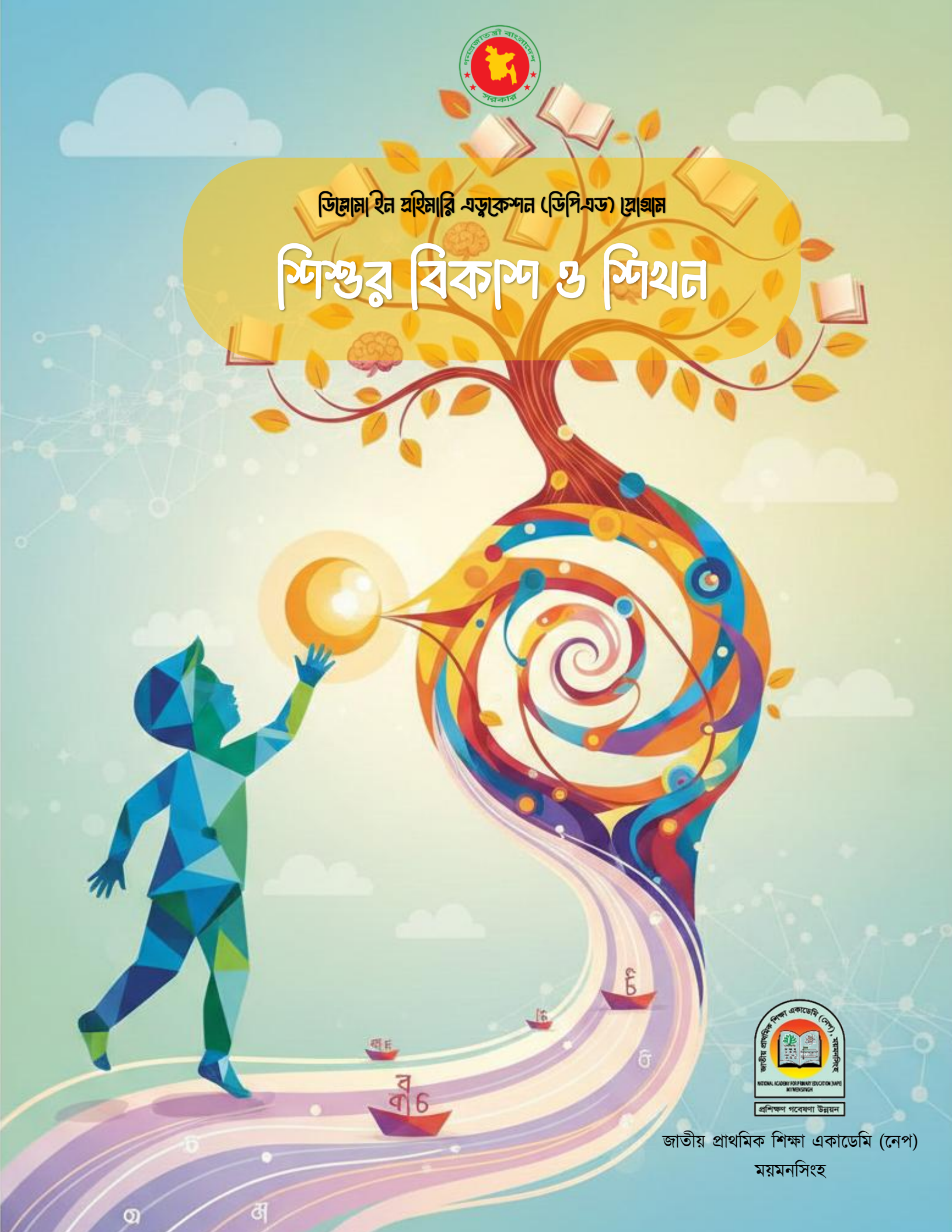

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

শিশুর বিকাশ ও শিখন

কোর্স কোড: ১০২

লেখকবৃন্দ

অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন, চাইল্ড এডোলেসেন্ট এন্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ

আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, সিনিয়র ফ্যাকাল্টি, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

নিশাত জাহান জ্যোতি, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সম্পাদক

মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক সহযোগিতা

মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

দিলরুবা আহমেদ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

সাদিয়া উম্মূল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

প্রচ্ছদ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৬

মুখবন্ধ

শিক্ষা একটি চলমান ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষা ব্যক্তির আচরণে ইতিবাচক ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তার সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করে এবং তাকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি দেশ ও জাতির উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলা। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ১০ মাস মেয়াদি **ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম** পরিচালিত হচ্ছে। এটি কোনো চাকরিকালীন বা চাকরিসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম নয়। বরং এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক।

ডিপিএড প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হবে। অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাদর্শন, শিখনতত্ত্ব, শিক্ষার কাঠামো ও প্রশাসন, শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা-বিষয়ক সমসাময়িক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয় থাকাতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভের পাশাপাশি এ সকল বিষয়বস্তু কীভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে উপস্থাপন করতে হবে তাও আয়ত্ত করতে পারবে। ডিপিএড প্রোগ্রামে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুশীলনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান সরাসরি প্রয়োগ করে হাতে-কলমে অনুশীলনের সুযোগ পাবে।

এই তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে এবং পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, পাঠ্যপুস্তকটি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে এই প্রত্যাশা রইল।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

বাণী

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি বিকাশের পাশাপাশি তাকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন এমন মানবসম্পদ, যারা জ্ঞাননির্ভর, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। এই মানবসম্পদ গঠনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা, যা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা করে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত প্রস্তুতি, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়; কার্যকর শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুসংগঠিত একাডেমিক প্রস্তুতি, আধুনিক শিক্ষণ ধারণা ও পেশাগত মূল্যবোধের সমন্বয়। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার জন্য মানসম্মত একাডেমিক প্রোগ্রামের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত ভূমিকা পালনে সহায়ক হতে পারে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি, শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এবং পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সমন্বিত ধারণা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষা পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এসব পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী শিক্ষা ধারণা অর্জন করবে এবং সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা বা পরিমার্জনের সুযোগ পরিলক্ষিত হলে তা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠনমূলক পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, আমি আশা ও বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে একটি দৃঢ় ও ফলপ্রসূ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

শিক্ষা মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও জীবনব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। এটি মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধের সমন্বিত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এবং তাকে মানবিক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একটি জাতির সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের ওপর। এই শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে, যা শিশুর সার্বিক বিকাশের সূচনালগ্ন হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ, নীতিবান ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের গুণগত মানে প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ বা পেশাগত অভিজ্ঞতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে পারেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ পেলেও পেশাগত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি তা শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে, যা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য একটি সুদৃঢ় একাডেমিক ভিত্তি ও পেশাগত সক্ষমতাসম্পন্ন জনবলের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হতে পারে; অর্থাৎ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী জনবল তৈরি হবে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মৌলিক ধারণা, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো, শিখন প্রক্রিয়া, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান, পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সীমিত মানবীয় প্রচেষ্টার কারণে এতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে তা সংশোধনের লক্ষ্যে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং যে উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিশুর বিকাশ ও শিখন

সূচিপত্র

ক্রম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	**শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ** শিশুর ধারণা, বয়সভেদে শিশুর আচরণ ও বৈশিষ্ট্য, শিশুর আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে শিক্ষক ও পরিবারের করণীয়, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারণা, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে প্রভাবক উপাদানসমূহ, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে শিক্ষক ও পরিবারের করণীয়, শিশুর বিকাশ ও শিখনের ক্ষেত্রসমূহ, শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতাসমূহ, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও শিখনের গুরুত্ব, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও শিখনে পরিবার ও বিদ্যালয়ের করণীয়, শিশুর বিকাশে খেলার গুরুত্ব, খেলার মাধ্যমে শিশুর বিকাশে পরিবার ও শিক্ষকের করণীয়	১-২৬
অধ্যায় ২	**শিশুর শিখন প্রক্রিয়া** শিশুর শিখনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, শিশুর শিখনে শিক্ষকের ভূমিকা, শিশুর শিখন-প্রতিবন্ধকতার সাধারণ ধরন, শিক্ষকবৃন্দের কী কী লক্ষণ খেয়াল রাখা দরকার, শিখন-প্রতিবন্ধকতা নিরসনে শিক্ষকবৃন্দের করণীয়, শিশুর শিখনের সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক, প্রারম্ভিক শৈশবে মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের গুরুত্ব, মানসিক সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণ ও শিশুর মানসিক চাপের কারণ, পরিবার ও বিদ্যালয়ের করণীয়	২৭-৩৯
অধ্যায় ৩	**শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব** জ্যাঁ পিঁয়াজে এর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ তত্ত্ব, পিঁয়াজের তত্ত্বের জ্ঞান বিকাশের স্তরসমূহ, লেভ ভিগটস্কি এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব, শিশুর শিখনে লেভ ভিগটস্কির তত্ত্বের প্রয়োগ, ব্রনফেনব্রেনার এর বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব, শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রভাব, শিখনের আচরণবাদ তত্ত্ব ইভান পাভলভের প্রাচীন সাপেক্ষণ তত্ত্ব, শিক্ষায় প্রাচীন সাপেক্ষণের প্রয়োগ, বি. এফ. স্কিনার এর করণ সাপেক্ষণ, শিক্ষায় স্কিনার তত্ত্বের প্রয়োগ, থর্নডাইক এর শিখন তত্ত্ব, থর্নডাইকের মতবাদের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট তাৎপর্য, ব্রুনার এর নব্য জ্ঞানবাদ, শিখন ব্যবস্থায় ব্রুনারের অবদান, আলবার্ট বান্দুরা এর সামাজিক জ্ঞানমূলক তত্ত্ব, শিক্ষাক্ষেত্রে বান্দুরার সামাজিক জ্ঞানমূলক তত্ত্বের অবদান	৪০-৬৪
অধ্যায় ৪	**মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশ** মস্তিষ্কের গঠন ও কাজ, মস্তিষ্কের বিকাশে পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহের প্রভাব, শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে অভিভাবকের করণীয়, শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষকের করনীয়	৬৫-৭০
অধ্যায় ৫	**একীভূত শিক্ষা** শিশুর বৈচিত্র্যপূর্ণ শিখন আচরণ, একীভূত শিক্ষার ধারণা, একীভূত শিক্ষা: শিক্ষণ কৌশল, একীভূত শিক্ষা: শিক্ষণ চ্যালেঞ্জ, একীভূত শিক্ষা: শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল, জেন্ডার সমতা	৭১-১১১
অধ্যায় ৬	**শিশুর শিখনে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের ভূমিকা** শিশুর শিখনে পরিবার ও সমাজ, শিশুর শিখনে প্রতিষ্ঠান	১১২-১১৬

অধ্যায় ১: শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ

মানব শিশু জন্মের পর থেকে শৈশবকালের প্রতিটি ধাপ এক অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন এবং শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের পূর্বে একজন শিক্ষকের জন্য শিশুর এই বিকাশমান প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা অপরিহার্য। কারণ, প্রতিটি শিশু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে বেড়ে ওঠে। তাদের ভেতরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে এবং একটি শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে শিক্ষকের কাছে শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও জ্ঞানীয় বিকাশের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এই অধ্যায়ে শিশুর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ, বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে শিখন প্রক্রিয়া কীভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই ধরণের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্বের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে, যা শিশুদের ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করে। শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলার ভূমিকা এবং একজন শিক্ষক হিসেবে করণীয় কী, তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায় শেষে, শিক্ষার্থীরা শিশুর মনস্তত্ত্ব বুঝতে এবং তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে কীভাবে শিশু-কেন্দ্রিক ও কার্যকর করে তোলা যায় এ বিষয়ে ধারণা লাভ করতে সমর্থ হবেন।

শিশুর ধারণা

সাধারণ অর্থে, শিশু হলো জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধির পূর্ব পর্যন্ত একটি মানবসত্তা, যে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক দিক থেকে দ্রুত বিকাশমান অবস্থায় থাকে। তবে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু কেবল একজন ক্ষুদ্র মানুষ নয়, বরং এমন একটি সত্তা যার মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা ও ক্ষমতা রয়েছে এবং যা পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। প্রতিটি শিশুই অনন্য। একটি শিশুর শেখার গতি, আগ্রহ, মেজাজ এবং প্রয়োজন অন্য শিশুর থেকে আলাদা। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC) এবং জাতীয় শিশু নীতি অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানুষই শিশু এবং তাদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, শিক্ষা লাভ ও অংশগ্রহণ-এর অধিকার রয়েছে। একজন শিক্ষকের কাছে শিশু হলো শিখন প্রক্রিয়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষককে অবশ্যই এই স্বতন্ত্র বিকাশমান সত্তাকে কেন্দ্র করে তার শিক্ষাদান পদ্ধতি সাজাতে হবে।

শিশুর বৈশিষ্ট্য

বিকাশের স্তরভেদে শিশুর বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত হয়, তবে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য হলো:

১. শিশু খুব দ্রুত শেখে, বিশেষ করে যখন শেখার পরিবেশ আনন্দময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়।

২. তারা প্রশংসা ও উৎসাহে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

৩. শিশুরা সহজেই মনোযোগ হারায়, তাই তাদের শেখাতে হলে ধৈর্য ও মজার কৌশল দরকার।

৪. তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে বোঝে এবং বিচার করে।

৫. শিশুরা সাধারণত নতুন বন্ধু বানাতে ও দলে মিশে কাজ করতে ভালোবাসে।

৬. তারা জড়বস্তুতেও প্রাণের উপস্থিতি কল্পনা করে, যেমন পুতুলকে জীবন্ত মনে করা।

৭. শিশুরা সাধারণত আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং নিজের দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু বোঝার চেষ্টা করে।

৮. তারা আনন্দময় পরিবেশে শেখা ও অংশগ্রহণ করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী থাকে।

৯. শিশুরা ভুল থেকে শেখে। তাদের ভুলকে শেখার অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

১০. তারা নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে চায়; কখনো কথায়, কখনো খেলায়, কখনো আঁকার মাধ্যমে।

১১. শিশুরা নিরাপত্তা ও স্নেহ পেলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

১২. তারা পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সময় নেয়, তাই নতুন পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে হয়।
১৩. শিশুরা তাদের সাফল্যে গর্ব অনুভব করে এবং নিজের কাজের স্বীকৃতি পেতে চায়।
১৪. তারা সহজেই আনন্দিত হয় এবং ক্ষুদ্র বিষয়েও তাদের খুশি করা যায়।
১৫. শিশুরা ন্যায়-অন্যায় বা ভালো-মন্দ বোঝার প্রাথমিক ধারণা খেলার মধ্য দিয়েই অর্জন করে।
১৬. শিশুদের পছন্দ, চাহিদা ও শিখনের ধরন আলাদা আলাদা হয়, যা তার বেড়ে ওঠার পরিবেশের ওপর নির্ভর করে।
১৭. শিশু আদর ও ভালোবাসা পেতে এবং বড়দের কাছে গ্রহণীয় হতে চায়।
১৮. শিশুরা সহজাতভাবেই কৌতূহলী। তারা প্রশ্ন করে, পরীক্ষা করে এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে জানতে চায়। এটি তাদের স্বাভাবিক শিখন প্রক্রিয়ার ভিত্তি।
১৯. তারা বড়দের এবং সমবয়সীদের কাজ, কথা ও আচরণ অনুকরণ করে ও শেখে।
২০. শিশুরা বাস্তবের পাশাপাশি কল্পনার জগতেও বসবাস করে। গল্প বলা, আঁকা এবং খেলায় তাদের এই সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়।
২১. শৈশবের শুরুতে তারা পুরোপুরি অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকলেও ধীরে ধীরে তারা নিজেদের কাজ নিজে করার এবং সিদ্ধান্ত নিতে শিখে।
২২. শিশুরা প্রকৃতিগতভাবেই সক্রিয় এবং খেলাধুলা করতে পছন্দ করে। এই শারীরিক কার্যক্রম তাদের শারীরিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

বয়সভেদে শিশুর আচরণ ও বৈশিষ্ট্য

একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু কিংবা একটি ৫ বছরের শিশুর বৈশিষ্ট্য কখনোই একই রকম হবেনা। বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা বয়স অনুসারে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। শিক্ষকতা পেশার জন্য এই প্রত্যেক স্তরের আচরণ ও বৈশিষ্ট্য জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশু গর্ভধারণ থেকে শুরু করে এক-একটি বয়সে গিয়ে বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা ও কথা বলা-এর মতো মৌলিক দক্ষতাগুলো অর্জন করে। খুব কম ক্ষেত্রেই এই চলমান বিকাশ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রতিটি শিশুই ধাপে ধাপে এক একটি দক্ষতা আয়ত্ত করে। যেমন; দেড় মাস বয়সে হাসি দেওয়া, ছয় মাসে অন্যের সহায়তায় বসা, নয় মাসে সহায়তা ছাড়া বসা, নয়-দশ মাসে হামাগুড়ি দেওয়া, বারো-চৌদ্দ মাসে হাঁটা শুরু করা, দুই বছর বয়সে স্বতন্ত্রভাবে হাঁটা ইত্যাদি। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জিত দক্ষতাগুলোকে সাধারণত **বিকাশের মাইলফলক** বলা হয়।
মানবজীবনে বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একটি ধাপ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী ধাপে প্রবেশ হয়। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত চলমান এই বিকাশ শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ভিত্তি গড়ে তোলে। বাংলাদেশে, *"শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩"* অনুযায়ী, গর্ভাধারন থেকে শিশুর আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে **প্রারম্ভিক শৈশব** ধরা হয়েছে। তাছাড়া ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে **মধ্য শৈশব** এবং ১২ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে **কৈশোরকাল** ধরা হয়। যদি কোনো একটি ধাপের বিকাশ ব্যাহত হয়, তবে পরবর্তী ধাপেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভালোভাবে হাঁটা না জানলে দৌড়াতে শিখতে অসুবিধা হয়; বা ঠিকভাবে দাঁড়ানো না শিখলে সঠিকভাবে হাঁটা শেখাও কঠিন হয়ে পড়ে। মানবজীবনের এই দীর্ঘ বিকাশ প্রক্রিয়াকে বয়স ও বিকাশের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যথা-

১। প্রারম্ভিক শৈশবকাল (Early Childhood)

বাংলাদেশের *শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩* অনুসারে জন্ম থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বিকাশকে চারটি প্রধান কালপর্বে ভাগ করা হয়েছে। এই সম্পূর্ণ স্তরটিকে বলা হয় শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবকাল। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (ECCD) বিষয়ক সেবাসমূহ ভ্রূণাবস্থা থেকে কমপক্ষে আট বছর পর্যন্ত চলমান রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে

শিশুর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রয়েছে। এই বয়সগুলোকে ভিত্তি করে শিশুদের জন্য উপযুক্ত যত্ন, পুষ্টি, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রারম্ভিক শৈশবকালের ৪ টি পর্যায়। যথা-

ক) গর্ভ ও প্রসবকাল

খ) জন্ম থেকে ৩ বছর

গ) ৩ থেকে ৬ বছর

ঘ) ৬ থেকে ৮ বছর

ক) গর্ভ ও প্রসবকাল

গর্ভ ও প্রসবকাল শিশুর জীবনচক্রের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময়ে মাতৃগর্ভে ভ্রুণাবস্থা থেকেই শিশুর শারীরিক গঠন, মস্তিষ্কের প্রাথমিক বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্রসব-পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে মায়ের পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি, বৃদ্ধি-রুদ্ধতা (Stunting-খর্বাকৃতি ও স্বল্প ওজনের শিশু) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ

১. গর্ভকালীন সময়েই শিশুর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ গঠিত হতে শুরু করে।
২. পর্যাপ্ত পুষ্টি ও মাতৃস্বাস্থ্য নিশ্চিত হলে শিশুর স্বাভাবিক ওজন ও দৈহিক গঠন বজায় থাকে।
৩. নিরাপদ ও সঠিক প্রসব প্রক্রিয়া শিশুর শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ

১. গর্ভকালেই শিশুর মস্তিষ্কের প্রাথমিক গঠন ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ শুরু হয়।
২. মাতৃগর্ভে পর্যাপ্ত পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ শিশুর ভবিষ্যৎ শেখার সক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে।
৩. গর্ভকালীন জটিলতা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ

১. মায়ের মানসিক অবস্থা ও পারিবারিক সহায়তা শিশুর প্রাথমিক সামাজিক বিকাশের ভিত্তি তৈরি করে।
২. গর্ভকাল থেকেই মা ও শিশুর মধ্যে আবেগিক সংযোগ (bonding) গড়ে ওঠে।
৩. প্রসবের পরপরই মা–শিশুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ সামাজিক বিকাশে সহায়ক হয়।

আবেগিক বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ

১. মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় শিশুর নিরাপত্তাবোধের ভিত্তি তৈরি হয়।
২. মায়ের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ শিশুর আবেগিক বিকাশে প্রভাব ফেলতে পারে।
৩. প্রসব-পরবর্তী যত্ন ও ভালোবাসা শিশুর নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার অনুভূতি গড়ে তোলে।

খ) জন্ম থেকে ৩ বছর

এই পর্যায়টি মানব জীবনের দ্রুততম বিকাশের সময়। মস্তিষ্কের প্রায় ৮০% গঠন এই সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই এই সময় শিশুর শারীরিক পুষ্টি, সুরক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

১. শিশু দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মাথা, হাত-পা নড়াচড়ার দক্ষতা অর্জন করতে থাকে।
২. বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, ধরার মতো প্রাথমিক পেশীজ/মোটর দক্ষতা গড়ে ওঠে।
৩. দৈনন্দিন কাজগুলোতে অন্যের সহায়তা প্রয়োজন হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

১. কিছু মৌলিক শব্দ, শারীরিক ভঙ্গি ও মুখভঙ্গি বুঝতে শুরু করে।
২. খেলনা ও বস্তু হাতে নেওয়া, নেড়ে দেখা এবং পরীক্ষা করার মাধ্যমে বস্তুর বৈশিষ্ট্য শেখে।
৩. পরিবেশ সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতূহল সৃষ্টি হয়। দেখা, ছোঁয়া ও আওয়াজের প্রতি সাড়া দেয়।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

১. শিশু পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গভীর সংযোগ তৈরি করে।
২. অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি লজ্জা বা দ্বিধা দেখা যায়।
৩. কান্না, হাসি, হাত নাড়ানো বা মৌলিক শব্দ, ছোট বাক্যের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে।

আবেগিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

১. নিরাপত্তা ও সান্ত্বনার জন্য মা-বাবা বা যত্নকারীর ওপর নির্ভরশীল থাকে।
২. আনন্দ, ভয়, দুঃখ বা অস্বস্তি হলে সরাসরি কান্না বা হাসির মাধ্যমে প্রকাশ করে।
৩. কিছুটা জেদ, রাগ বা অস্থিরতা এই বয়সে সাধারণভাবে দেখা যায়।

খ) ৩ থেকে ৬ বছর

এই পর্যায়ে শিশু দ্রুত ভাষা শেখে, কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক আচরণ গঠিত হয়। শিক্ষার আনুষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরির জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- এই পর্যায়ে শিশুর বৃদ্ধি ধীরে হলেও ঘটে, এবং দৌড়ানো, লাফানো, বল ছোড়া বা আঁকার মতো পেশীজ/মোটর দক্ষতাগুলোর উন্নত হয়।
- নিজে নিজে খাবার খাওয়া, পোশাক পরা, নিজের জিনিসপত্র গুছানোর মতো অভ্যাস গঠন শুরু হয়।
- হাত ও চোখের সমন্বয় হওয়ায় খেলাধুলা ও সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- বাক্য গঠন উন্নত হয় এবং শব্দভান্ডার দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- কল্পনাশক্তি প্রবল হয়ে ওঠে, শিশু গল্প তৈরি করে, খেলায় কাল্পনিক চরিত্র ব্যবহার করে।
- রং, আকার, সংখ্যা, সময় সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা শিখতে থাকে।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে খেলা ও মেলামেশার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- খেলায় নিয়ম মানা এবং সহযোগিতা করার দক্ষতা ও মানসিকতা গড়ে ওঠে।
- অন্যের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা শুরু করলেও মাঝে মাঝে আত্মকেন্দ্রিক আচরণ দেখা যেতে পারে।

আবেগিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- এই পর্যায়ে শিশু আবেগ খুব সরাসরি প্রকাশ করে। রাগ, আনন্দ, দুঃখ, ভয় সবই পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।
- প্রশংসা পেলে উৎসাহিত হয় এবং ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।
- পরিবারের সঙ্গে নিরাপত্তাবোধ জোরালো থাকে এবং আশ্বাসের প্রয়োজন হয়।

গ) ৬ থেকে ৮ বছর

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ অনুযায়ী এই বয়সকে প্রারম্ভিক শৈশবের বিস্তৃত অংশ ধরা হয়েছে, কারণ এই সময়েই শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই ৬-৮ বছর বয়সকালকে প্রারম্ভিক ও মধ্য শৈশবের সংযোগকাল বা রূপান্তরকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- এ বয়সে শিশুর পেশিশক্তি ও শারীরিক সহনশীলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং দৈনন্দিন কাজের প্রতি তাদের স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয়।
- খেলাধুলা, দৌড়ানো বা বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে শিশুর শারীরিক সমন্বয় আরও উন্নত হয়।
- হাত চালনা, আঁকাআঁকি বা সূক্ষ্ম পেশীজ/মোটর দক্ষতা ব্যবহার করে কাজ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- জটিল বাক্য গঠন, ভাষা ব্যবহার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা উন্নত হয়।
- নতুন বিষয় নিয়ে কৌতূহল বাড়ে এবং সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক দক্ষতা গড়ে ওঠে।
- পড়াশোনা, শব্দ শেখা এবং বিভিন্ন ধারণা জানা ও শোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, দলগত খেলা এবং সহযোগিতামূলক কাজে অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে।
- সামাজিক নিয়ম, ন্যায্যতা ও আচরণগত প্রত্যাশা সম্পর্কে শিশুর বোধ আরও স্পষ্ট হয়।
- বন্ধুত্বের মূল্য অনুভব করতে শুরু করে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতার প্রবণতা তৈরি হয়।

আবেগিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক সক্ষমতা দেখা দেয়; তবে মাঝে মাঝে রাগ বা হতাশা প্রকাশ করতে পারে।
- প্রশংসা, উৎসাহ ও স্বীকৃতি পেলে শিশুর আত্মবিশ্বাস স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।
- পরিবার, শিক্ষক ও পরিচিত পরিবেশের প্রতি নিরাপত্তা ও নির্ভরতার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

২) মধ্য শৈশবকাল (Middle Childhood)

যদিও প্রারম্ভিক শৈশবকাল ভ্রুণাবস্থা থেকে ৮ বছর পর্যন্ত ধরা হয়, তবে প্রারম্ভিক শৈশব এর ৩য় পর্যায় (৬-৮ বছর) থেকেই মধ্য শৈশবকাল এর যাত্রা শুরু হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। বিকাশগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রারম্ভিক শৈশবকালকে জন্ম থেকে ৮ বছর পর্যন্ত ধরা হলেও, শিক্ষাগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্য শৈশবকাল সাধারণত ৬ বছর বয়স থেকে শুরু হয়। ফলে ৬-৮ বছর বয়সকালকে প্রারম্ভিক ও মধ্য শৈশবের মধ্যবর্তী একটি রূপান্তরকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে উভয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে বিদ্যমান থাকে। এসব বিবেচনায় ৬ থেকে ১২ বছর বয়সকে মধ্য শৈশবকাল ধরা হয়। এ বয়সে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও নৈতিক চেতনা আরও বিকশিত হয়। বিদ্যালয় শিশুর এই সময়ের বিকাশে প্রধান ভূমিকা রাখে। এই বয়সে শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে গতি পায়। বিদ্যালয়, পরিবার ও সমবয়সীদের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- এ বয়সে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকে, তবে শক্তি, সহনশীলতা ও দৈহিক দক্ষতা ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে।
- খেলাধুলা,সাইকেল চালানো, দৌড় প্রতিযোগিতা বা অন্যান্য শারীরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের পেশীজ কার্যক্রমের সমন্বয় ও দক্ষতা আরও উন্নত হয়।

- শিশুরা নিজেদের শরীর, শারীরিক সক্ষমতা ও পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- এ বয়সে মনোযোগের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তারা দীর্ঘসময় ধরে পড়াশোনা বা নির্দিষ্ট কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়।
- যুক্তি, বিশ্লেষণ করা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়।
- পড়া, লেখা ও গণিতের ভিত্তিগত দক্ষতা আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার ধারণাগত কাঠামো শক্তিশালী হয়।
- বাস্তবধর্মী চিন্তা বৃদ্ধি পায় এবং তারা কল্পনার তুলনায় বাস্তবতার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখায়।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- এই বয়সে বন্ধুত্ব ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং বন্ধুরা আবেগ আদান প্রদানের প্রধান অংশীদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
- দলগত কাজে অংশগ্রহণ, নিয়ম মানা এবং দায়িত্ববোধ গড়ে উঠতে থাকে।
- ন্যায় অন্যায়, গ্রহণযোগ্য আচরণ ও সামাজিক নিয়ম নীতি সম্পর্কে শিশুর বোধ আরও স্পষ্ট হয়।

আবেগিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজের অনুভূতি বুঝতে ও পরিচালনা করতে পূর্বের তুলনায় বেশি সক্ষম হয়ে ওঠে।
- নিজের সক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা ও ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়, যা ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপন করে।
- প্রশংসা ও সমালোচনার প্রতি তারা সংবেদনশীল থাকে এবং তা তাদের আত্মবিশ্বাসে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।
- এ বয়সে আত্মমর্যাদা ধীরে ধীরে গঠিত হয়, যা তাদের ভবিষ্যৎ আচরণ, সামাজিক দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

৩) কৈশোরকাল (Adolescence)

কৈশোরকাল মানবজীবনে শারীরিক ও মানসিক দ্রুত পরিবর্তনের সময়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুযায়ী এটি ১০-১৯ বছর বয়সের মধ্যে হলেও বাংলাদেশসহ অনেক দেশে ১২-১৮ বছরকেই কার্যকর কৈশোরকাল ধরা হয়। এই বয়সে ব্যক্তিত্ব, পরিচয়বোধ, নৈতিকতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তি গড়ে ওঠে।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- এই সময়ে দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি বা পরিবর্তন দেখা দেয়, ফলে উচ্চতা, ওজন ও পেশিশক্তির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।
- বেশকিছু যৌন বৈশিষ্ট্য বিকাশ পেতে থাকে। যেমন ছেলেদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন, মেয়েদের মাসিক শুরু, শরীরের লোম বৃদ্ধি, গঠন পরিবর্তন ইত্যাদি।
- এই সময়ে শরীরে হরমোন সক্রিয় হয় এবং তার প্রভাবে শরীর দ্রুত বেড়ে ওঠে ও প্রজননক্ষমতা তৈরি হয়।
- কিশোর-কিশোরীরা নিজের চেহারা, দেহের গড়ন ও সৌন্দর্য সম্পর্কে বেশি সচেতন হয়ে ওঠে এবং শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোযোগ বাড়ে।
- শক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়, ফলে খেলাধুলা, দৌড়, সাঁতার বা শারীরিক পরিশ্রমী কাজে দক্ষতা বাড়ে।

বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- এই সময়ে কিশোর কিশোরীদের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, যুক্তিবোধ ও সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা বাড়তে থাকে।

- কিশোররা বিমূর্ত চিন্তা (abstract thinking) শিখতে শুরু করে; আদর্শবাদ, নৈতিকতা, অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে ভাবতে শেখে।
- পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখার সক্ষমতা বাড়ে এবং কঠিন বা বিশ্লেষণধর্মী ধারণা বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- পেশা, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, মূল্যবোধ ও নিজের পরিচয় সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করে।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- এই সময়ে সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং বন্ধুদের মতামত তাদের আচরণে বড় ভূমিকা রাখে।
- সামাজিক পরিচয় বা *peer identity* গড়ে উঠতে থাকে, ফলে দলগত কার্যক্রম, গ্রুপে অন্তর্ভুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সহমর্মিতা বেড়ে যায়।
- ন্যায়-অন্যায়, সমাজের নিয়ম, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব ও সহযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
- পরিবার থেকে একটু স্বাধীন হতে চাইলেও, পরিবারই তাদের জন্য নিরাপত্তা ও ভরসার প্রধান উৎস হয়ে থাকে।

আবেগিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ

- হরমোনজনিত কারণে আবেগ দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়; কখনো খুব ভালো লাগা, হাসি খুশি, আবার কিছুক্ষণ পরেই রাগ, দুঃখ বা হতাশার অনুভূতি আসতে পারে।
- আমি কে? আমাকে কী হতে হবে? এ ধরনের আত্মপরিচয়মূলক প্রশ্ন তাদের মনে ঘোরে। এসব অনুসন্ধান তার নিজের পরিচয় গঠনের একটি স্বাভাবিক ধাপ।
- নিজের সক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা, আত্মমর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপলব্ধি বাড়ে।
- প্রশংসা ও সমালোচনার প্রতি দ্রুত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বা প্রত্যাখ্যান কিংবা অন্যরা তাকে গ্রহণ করছে কি না, অন্যরা তাকে নিয়ে কী ভাবছে এসব বিষয় তাদের আবেগে গভীর প্রভাব ফেলে।

বিকাশের মাইলফলকের গুরুত্ব

শিশুর বিকাশ এর প্রতিটি বয়সের ধাপ এবং তার মাইলফলকগুলো শিশুকে পরবর্তী ধাপে উন্নতির জন্য প্রস্তুত করে। সঠিক সময়ে মাইলফলক অর্জন শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ নিশ্চিত করে। এই ধাপগুলো জানা শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা শিশুর বিকাশ পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া-

১. প্রতিটি বিকাশের ধাপ পরবর্তী ধাপের ভিত্তি তৈরি করে।
২. সঠিক সময়মতো প্রতিটি মাইলফলক অর্জন শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করে।
৩. কোনো ধাপ ঠিকভাবে না হলে পরবর্তী ধাপে সমস্যা দেখা দিতে পারে।
৪. শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করে।
৫. সামাজিক আচরণ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ শেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
৬. শিশুর শেখার ধরন ও পছন্দ অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করে।
৭. মাইলফলকগুলো শিশুদের সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
৮. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও যত্ন পরিকল্পনায় অবদান রাখে।
৯. অভিভাবকরা শিশুর বিকাশ বুঝে সঠিক সহায়তা দিতে পারে।
১০. সমস্যা বা কোনো বিকাশে বিলম্ব চিহ্নিত করতে পারলে দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়।
১১. শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা গড়ে ওঠে।
১২. প্রতিটি ধাপ শেখার আনন্দ ও মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে।
১৩. শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও সামাজিক দক্ষতার ভিত্তি স্থাপন করে।

১৪. বিকাশের মাইলফলক শিক্ষাবিদ, শিশু বিশেষজ্ঞ ও যত্নকারীর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষকের করণীয়

শিশুর জন্ম থেকে কৈশোরকাল পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই শারীরিক, মানসিক, ভাষাগত, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ ভিন্নভাবে ঘটে এবং প্রতিটি পর্যায়েই তাদের চাহিদা ও আচরণ পরিবর্তিত হয়। এই সময়ে উপযুক্ত যত্ন, নিরাপদ পরিবেশ, খেলাধুলা, শেখার সুযোগ এবং স্নেহভিত্তিক আচরণ শিশুর সুস্থ বিকাশের ভিত্তি গড়ে তোলে। শিক্ষকের সংবেদনশীলতা, পর্যবেক্ষণ, সহমর্মিতা এবং বয়স উপযোগী শিক্ষণ কৌশল শিশুদের শেখা ও আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। প্রতিটি বয়সে তাদের শেখার ধরণ, সামাজিক সম্পর্ক ও আবেগের প্রকাশ আলাদা হওয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা সময়ভেদে পরিবর্তিত হওয়া জরুরি।

১. জন্ম থেকে ৩ বছর বয়সে অনেক উন্নত দেশে শিশুদের যত্ন ও বিকাশে প্রশিক্ষিত শিশু শিক্ষক বা caregiver এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ডসহ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে ১-৩ বছর বয়স থেকেই সরকার নিয়ন্ত্রিত ডে-কেয়ার সেবায় শিশুরা পেশাদার শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যেও জন্ম থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুরা licensed childcare centres-এ educators-এর সহায়তায় বড় হয়। জাপান ও সিঙ্গাপুরেও ২ মাস বয়স থেকে শিশুদের পেশাদার কেয়ার স্টাফের অধীনে রাখা হয়। বাংলাদেশেও স্বল্প পরিসরে এই বয়সী শিশুদের জন্য কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যা শিশুর পরবর্তী শিক্ষাজীবনের ভিত্তি তৈরি করে। শিক্ষক বা caregiver এর করণীয় হলো-

- শিশুর জন্য নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও স্নেহপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা।
- চোখের যোগাযোগ, হাসি, কথা বলা ও গান শোনানোর মাধ্যমে ভাষা ও আবেগ বিকাশে সহায়তা করা।
- রঙ, শব্দ, স্পর্শ ও নড়াচড়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় উদ্দীপনা (sensory play) দেওয়া।
- খেলনা ধরা, বসা, দাঁড়ানো, হাঁটার অনুশীলনে সহায়তা করা।
- কান্না, ভয় বা অস্থির অবস্থায় সান্ত্বনা দিয়ে নিরাপত্তাবোধ তৈরি করা।
- অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও যত্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

২. ৩ থেকে ৬ বছর বয়সে শিশুর ভাষা, সামাজিকতা, খেলা, কল্পনা ও শেখার মৌলিক দক্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সময় খেলা-ভিত্তিক শেখার মাধ্যমে শিশু আশপাশের পৃথিবীকে বুঝতে শেখে এবং সামাজিক আচরণের ভিত্তি তৈরি হয়। এসময় শিক্ষকের করণীয় হলো-

- খেলা-ভিত্তিক শিক্ষাদান (play-based learning) নিশ্চিত করা।
- আঁকাআঁকি, গল্প বলা, গান, ছড়া, নাটক ও ভূমিকাভিত্তিক খেলার সুযোগ তৈরি করা।
- দলগত খেলায় নিয়ম মানা, ভাগাভাগি করা ও সহযোগিতা শেখানো।
- ভাষা, রং, সংখ্যা, আকার, সময় ইত্যাদি মৌলিক ধারণা সহজভাবে শেখানো।
- শিশু আবেগ প্রকাশ করলে তা গ্রহণ করা, সান্ত্বনা দেওয়া ও ইতিবাচক আচরণে উৎসাহ দেওয়া।
- প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্র শেখার ধরণ অনুযায়ী সহায়তা করা।

৩. ৬-৮ বছর বয়সে শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয়। এ সময় তারা পড়া, লেখা ও গণিতের প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করে, পাশাপাশি নিয়ম, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের ধারণা গড়ে ওঠে। এসময় শিক্ষকের করণীয় হলো-

- পড়া, লেখা, গণিতের ভিত্তি গঠনে আকর্ষণীয় কৌশল ব্যবহার করা।
- দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান ও অনুসন্ধানমূলক শেখার সুযোগ দেওয়া।
- ন্যায়-অন্যায়, নিয়ম মানা ও দায়িত্ববোধ শেখানো।
- সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও শৃঙ্খলার অভ্যাস তৈরি করা।

- আত্মবিশ্বাস কমে গেলে উৎসাহ দেওয়া এবং ছোট ছোট সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া।
- শেখার জন্য আনন্দ বা উদ্দীপনা তৈরি করা ও অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া।

৪. মধ্য কৈশোর অর্থাৎ ৬-১২ বছর বয়সে শিশু যুক্তিবোধ, বিশ্লেষণ, সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক দক্ষতা আরও সুসংগঠিতভাবে গড়ে তোলে। স্কুল, সহপাঠী ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা তাদের ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা বিকাশে বড় ভূমিকা রাখে। এসময় শিক্ষকের করণীয় হলো-

- যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বাস্তব উদাহরণভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া।
- দলগত কাজ, নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার চর্চা করানো।
- বন্ধুত্ব, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে ইতিবাচক শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরি করা।
- শিশুর আত্মমর্যাদা বাড়াতে প্রশংসা, পরামর্শ ও গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া দেওয়া।
- আবেগ বা আচরণগত সমস্যা বুঝে সহানুভূতির পাশাপাশি সহায়তা প্রদান করা।
- প্রকল্পভিত্তিক কাজ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বাস্তবধর্মী চিন্তা বাড়ানো।
- অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে শিশুর শেখার অগ্রগতি ও সহায়তার বিষয় জানানো।

৫. ১২-১৮ বছর বয়সে শিশুর শারীরিক পরিবর্তন, আবেগের ওঠানামা, নিজের পরিচয় খোঁজা, স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা দ্রুত বিকশিত হয়। এ বয়সে শিক্ষককে সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল, গ্রহণযোগ্য ও দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করতে হয়। এসময় শিক্ষকের করণীয় হলো-

- তাদের মতামত, অনুভূতি ও স্বাধীনতাকে সম্মান করা।
- পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও যুক্তিবোধ গঠনে সহায়ক আলোচনা করা ও সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- নিরাপদ, non-judgmental শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা।
- ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, ক্যারিয়ার ও জীবনদক্ষতার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া।
- আবেগের ওঠানামায় তিরস্কার না করে সহমর্মিতা ও পরামর্শ দেওয়া।
- সমবয়সীদের প্রভাব, অনলাইন নিরাপত্তা, সম্পর্ক, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।
- তাদের আত্মপরিচয় গঠনকে সম্মান করা ও ইতিবাচক রোল মডেল হওয়া।
- পড়াশোনায় চাপ না দিয়ে শেখার কৌশল, সময় ব্যবস্থাপনা ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়তা করা।

পরিবারের করণীয়

শিশুর জন্ম থেকে কৈশোর পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি বয়সে শিশুর শারীরিক, মানসিক, ভাষাগত, সামাজিক ও আবেগিক চাহিদা আলাদা হওয়ায় অভিভাবকের দায়িত্বও সময়ভেদে পরিবর্তিত হয়। উপযুক্ত যত্ন, নিরাপদ পরিবেশ, স্নেহভিত্তিক আচরণ এবং শিশুদের শেখার জন্য উৎসাহ প্রদান তাদের সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে পরিবারের করণীয় হলো-

১. জন্ম থেকে ৩ বছর (প্রারম্ভিক শৈশবকাল)

- শিশুর শারীরিক পুষ্টি ও নিরাপত্তা, যথাযথ খাদ্য, ঘুম ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করা।
- শিশুর সঙ্গে স্নেহপূর্ণ সংযোগ তৈরি করা, শিশুর সাথে আলাপ বা গল্প করা, আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা দেওয়া।
- শিশুর কৌতূহল ও আবেগ প্রকাশের প্রতি সংবেদনশীল থাকা এবং তাকে উৎসাহ দেওয়া।
- নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা, যাতে শিশুটি স্বাধীনভাবে খেলতে ও শিখতে পারে।
- মৌলিক ভাষা ও শব্দ শেখার জন্য প্রতিদিন কথাবার্তা বলা এবং পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করানো।

- শিশুর প্রাথমিক পেশীজ/মোটর দক্ষতা বিকাশে তার সাথে খেলা করা, খেলনার ব্যবস্থা করা ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২. **৩ থেকে ৬ বছর (প্রারম্ভিক শৈশবকাল)**

- শিশুকে নিজে নিজে কাজ করার সুযোগ দেওয়া (খাবার খাওয়া, পোশাক পরা, জিনিসপত্র গুছানো ইত্যাদি)।
- গল্প, গান, রং, খেলনা ও সৃজনশীল খেলাধুলার মাধ্যমে ভাষা ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করা।
- সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দেওয়া এবং সামাজিক আচরণ শেখানো।
- নিয়ম ও দায়িত্বশীল আচরণ শেখানোর জন্য ছোট ছোট দায়িত্ব প্রদান করা।
- শিশুর আবেগ ও অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করা এবং প্রশংসা বা উৎসাহ দিয়ে সাহস প্রদান করা।
- শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করা, যাতে শিশুর প্রাথমিক/আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

৩. **৬ থেকে ৮ বছর (প্রারম্ভিক শৈশবকাল)**

- শিশুকে দৈনন্দিন কাজ ও শারীরিক কার্যক্রমে স্বাচ্ছন্দ্যবোধের সুযোগ দেওয়া।
- পড়াশোনা, শব্দ শেখা ও সমস্যা সমাধানের জন্য উৎসাহ দেওয়া।
- বন্ধু ও দলগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা, সামাজিক ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা।
- শিশুর আবেগ ও আচরণে সহমর্মিতা দেখানো এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানো।
- শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়াতে পরিবারে পঠন-পাঠনের পরিবেশ তৈরি করা।
- শিশুকে নিরাপদ, সুরক্ষিত ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ প্রদান করা, যা তার আত্মবিশ্বাস গঠনে সহায়ক।

৪. **৬-১২ বছর (মধ্য শৈশবকাল)**

- শিশুর দৈহিক সক্ষমতা, খেলাধুলা ও শারীরিক কার্যক্রমে সহায়তা ও উৎসাহ দেওয়া।
- যৌক্তিক চিন্তা, সমস্যা সমাধান এবং পাঠ্যক্রমে আগ্রহ বাড়াতে প্রেরণা দেওয়া।
- বন্ধু, স্কুল ও সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে শিশুকে সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।
- শিশুর আবেগ, সীমাবদ্ধতা ও সক্ষমতার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া।
- প্রশংসা ও সমালোচনার মাধ্যমে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা।
- দায়িত্বশীলতা ও নিয়ম মানার অভ্যাস গড়ে তুলতে পরিবারে ছোট ছোট দায়িত্ব প্রদান করা।

৫. **১২-১৮ বছর (কৈশোরকাল)**

- শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনকে বোঝা এবং স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের জন্য সহায়তা করা।
- আত্মপরিচয়, লক্ষ্য, মূল্যবোধ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শ দেওয়া।
- বন্ধু ও সমবয়সী বন্ধুত্বকে সমর্থন করা, তবে পরিবারের নিরাপত্তা ও সহায়তার প্রভাব বজায় রাখা।
- আবেগের দ্রুত পরিবর্তন এবং মানসিক চাপের সময় শিশুর সঙ্গে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা।
- শিশুর শিক্ষা, ভালো পরিকল্পনা ও দায়িত্বশীলতার দিকে মনোযোগী হতে উৎসাহিত করা।
- শিশুর স্বাধীনতা ও দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে বিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধ বজায় রাখা।

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and Development)

প্রতিটি শিশু তার জন্মের পর থেকেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। জন্মের সময় সে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অবস্থায় থাকে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার দেহের আকার, ওজন, বুদ্ধি, চিন্তা, ভাষা, অনুভূতি ও সামাজিক আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনগুলোই শিশু বিকাশের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একজন শিক্ষক হিসেবে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে শিক্ষণ কার্যক্রম, মূল্যায়ন এবং শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা সহজ হয়।

বৃদ্ধি (Growth)

বৃদ্ধি বলতে শিশুর শারীরিক আকার ও গঠনগত পরিবর্তনকে বোঝায়। এটি পরিমাপযোগ্য (quantitative) পরিবর্তন। যেমন উচ্চতা বৃদ্ধি, ওজন বৃদ্ধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি, দাঁত ওঠা ইত্যাদি। বৃদ্ধি শিশুর দৈহিক অগ্রগতি ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, যা এক সময় পর্যন্ত ঘটে এবং পরবর্তীতে থেমে যায়।

বিকাশ (Development)

বিকাশ হলো শিশুর মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও জ্ঞানগত পরিবর্তনের গুণগত (qualitative) প্রক্রিয়া। এটি শুধুমাত্র শরীরের বৃদ্ধি নয়, বরং ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, আচরণ, চিন্তাশক্তি ও অনুভূতির ক্রমাগত রূপান্তর। বিকাশের প্রক্রিয়া আজীবন চলে শৈশব থেকে কৈশোর, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থা ও বার্ধক্য পর্যন্ত।

বৃদ্ধি ও বিকাশের পার্থক্য

বৃদ্ধি	বিকাশ
বৃদ্ধি হলো শারীরিক ও পরিমাপযোগ্য পরিবর্তন। যেমন উচ্চতা, ওজন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার বৃদ্ধি ইত্যাদি।	বিকাশ হলো মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও আচরণগত গুণগত পরিবর্তন। যেমন চিন্তা, অনুভূতি, মনোভাব, দক্ষতা ইত্যাদি।
বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ঘটে; সাধারণত কৈশোরের পর শারীরিক বৃদ্ধি স্থিতিশীল হয়ে যায়।	বিকাশ আজীবন চলমান; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মনোভাব, জ্ঞান ও আচরণ পরিবর্তিত হতে থাকে।
বৃদ্ধি মূলত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উচ্চতা, ওজন ও শারীরিক কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায়।	বিকাশ নির্দেশ করে চিন্তা, ভাষা, আচরণ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক দক্ষতার উন্নয়নকে।
বৃদ্ধি সরাসরি মাপা যায়। যেমন সেন্টিমিটার, কিলোগ্রাম ইত্যাদি।	বিকাশ সরাসরি মাপা যায় না; পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন বা আচরণের মাধ্যমে বোঝা যায়।
বৃদ্ধি বিকাশের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সুস্থ শরীর মানসিক ও সামাজিক বিকাশকে সহায়তা করে।	বিকাশ বৃদ্ধি থেকে পাওয়া সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধ ও অর্থবহ করে তোলে। দক্ষতা, চিন্তাশক্তি ও সামাজিক আচরণ শিশুকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।
বৃদ্ধির ওপর পুষ্টি, স্বাস্থ্য, জিনগত বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।	বিকাশে পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, সামাজিক সম্পর্ক, ভাষা ও ভালোবাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বৃদ্ধি সাধারণত পরিমাণগত পরিবর্তন যা সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য।	বিকাশ গুণগত পরিবর্তন যা আচরণ ও সক্ষমতার উন্নতির মাধ্যমে বোঝা যায়।

শিশুর বিকাশে প্রভাবক উপাদানসমূহ

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ একটি অবিচ্ছিন্ন ও জটিল প্রক্রিয়া, যা জন্মের মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে ধীরে ধীরে শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। একটি শিশুর বিকাশ শুধু তার জৈবিক পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিবার, পরিবেশ, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ভালোবাসাসহ নানাবিধ উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবে গড়ে ওঠে তার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার ভিত্তি। প্রতিটি শিশু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, কিন্তু তার বিকাশের প্রকৃত রূপ নির্ভর করে পরিবার, বংশগগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্মিলনে। তাই শিশুর সামগ্রিক বিকাশকে বুঝতে হলে বংশগতির পাশাপাশি পরিবেশ, পুষ্টি, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং স্নেহ-ভালোবাসার গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। শিশুর বহুমাত্রিক বিকাশে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান প্রভাব ফেলে। এই উপাদানগুলো শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন, আচরণ, শেখার সক্ষমতা এবং সমাজে মানিয়ে নেওয়ার দক্ষতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে শিশুর বিকাশে প্রভাবক প্রধান উপাদানগুলো তুলে ধরা হলো-

১. বংশগত কারণ

বংশগত উপাদান শিশুর বিকাশে সবচেয়ে মৌলিক ও স্থায়ী প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। জন্মের মুহূর্ত থেকেই শিশুর শারীরিক গঠন, ত্বকের রং, চোখের রং, উচ্চতা, দেহের কাঠামো, বুদ্ধিমত্তা, স্বভাব এবং ব্যক্তিত্বের অনেক দিক পিতামাতার বৈশিষ্ট্য থেকে (জিনগত) নির্ধারিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতা যদি উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বা নির্দিষ্ট শারীরিক বৈশিষ্ট্যের হন, তবে সন্তানের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য বহনের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে বংশগত বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র সম্ভাবনা প্রদান করে। আর এই সম্ভাবনা কতটা বিকশিত হবে তা নির্ভর করে শিশুকে ঘিরে থাকা পরিবেশ, যত্ন, পুষ্টি, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ওপর। অর্থাৎ, পিতামাতা থেকে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য (জিনগত) শিশুর জন্মগত ভিত্তি তৈরি করলেও পরিবেশ সেই ভিত্তিকে সক্রিয় করে সত্যিকারের বিকাশের ধারা গড়ে তোলে।

২. পরিবেশগত কারণ

শিশুর জন্মের পর থেকেই সে যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, সেটিই তার বিকাশের গতি, ধরন এবং সুযোগ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা শিশুর মানসিক গঠন, আচরণ, মূল্যবোধ ও সামাজিক দক্ষতায় গভীর প্রভাব ফেলে। একটি ইতিবাচক, নিরাপদ ও স্নেহপূর্ণ পরিবেশ শিশুর আত্মবিশ্বাস, কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা ও শেখার আগ্রহ বাড়ায়। অন্যদিকে, ভয়, অবহেলা, সহিংসতা বা প্রতিকূল পরিবেশ শিশুর মানসিক স্থিতি দুর্বল করে এবং তার পূর্ণ বিকাশকে ব্যাহত করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শেখার পদ্ধতি, সহপাঠীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া সবকিছু শিশুর সামাজিক আচরণ, নেতৃত্বগুণ, সহযোগিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

৩. পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্যতম ভিত্তি হলো পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা। জন্মের পর থেকে শিশুকে পর্যাপ্ত, সুষম ও বয়সোপযোগী খাদ্য খাওয়ালে শিশুর দেহের বৃদ্ধি, হাড়-মাংসপেশির শক্তি, মস্তিষ্কের গঠন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অপুষ্টি বা অসম্পূর্ণ পুষ্টি শিশুর শারীরিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে, দুর্বলতা সৃষ্টি করে এবং শেখার ক্ষমতা, মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাকে কমিয়ে দেয়। পাশাপাশি নিয়মিত টিকাদান, বিশুদ্ধ পানি, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও পর্যাপ্ত ঘুম শিশুর সামগ্রিক বিকাশে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। একটি সুস্থ শিশু শিখন-প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে, খেলাধুলায় মনোযোগী হতে পারে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়।

৪. অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা

শিশুর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা তার চিন্তাশক্তি, আচরণ, কল্পনাশক্তি, সামাজিক দক্ষতা ও শেখার ধারণাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। পরিবারে ব্যবহৃত ভাষা, পিতামাতার আচরণ, খেলাধুলা, সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ, গল্প, গান, ছবি দেখা, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এসবই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বিকাশের ভিত্তি গড়ে তোলে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা, শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক শিশুকে শুধু জ্ঞানই দেয় না, বরং তার সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, সহযোগিতার মনোভাব, নেতৃত্বের গুণ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং আত্মশৃঙ্খলা তৈরিতে সহায়তা করে। খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, গান, ছড়া, নাটক এবং অন্যান্য সৃষ্টিশীল কার্যক্রম শিশুদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল চিন্তা বাড়ায়। অর্থাৎ, শিক্ষার অভিজ্ঞতা যত বৈচিত্র্যময় হবে, শিশুর বিকাশ ততই সমৃদ্ধ হবে।

৫. ভালোবাসা ও যত্ন

শিশুর আবেগিক বিকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি হলো ভালোবাসা, স্নেহ, নিরাপত্তা এবং ইতিবাচক যত্ন। পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও অভিভাবকের ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নিরাপত্তাবোধ, সামাজিক বন্ধন এবং ইতিবাচক আত্মধারণা সৃষ্টি করে। একটি শিশুকে যখন নিয়মিতভাবে উৎসাহ, প্রেরণা ও স্নেহ দেওয়া হয়, তখন সে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আশাবাদী হয় এবং নতুন কিছু শেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিপরীতে, কঠোর আচরণ, অবহেলা বা মানসিক চাপ শিশুর আবেগিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে, যা তার সামাজিক সম্পর্ক, আত্মবিশ্বাস ও শিখন-ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ভালোবাসা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন, মূল্যবোধ শেখা এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিশুর বিকাশ একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া, যেখানে বংশগত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত প্রভাব একসাথে কাজ করে। পুষ্টি, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ভালোবাসা সবগুলো উপাদান পরস্পর সম্পর্কিত। তাই শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ নিশ্চিত করতে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ সবাইকে মিলিতভাবে একটি সহায়ক ও উদ্দীপনামূলক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের গুরুত্ব

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ তার সার্বিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি, যা তাকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। জন্ম থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে শিশুর শারীরিক, মানসিক, ভাষাগত, সামাজিক ও আবেগিক রূপান্তর ঘটে। আর এই পরিবর্তনগুলো তাকে শেখার, বোঝার এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা প্রদান করে। শারীরিক বৃদ্ধি যেমন শিশুকে নিজস্ব শক্তি, সক্ষমতা ও দৈনন্দিন কাজের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে, তেমনি মানসিক ও জ্ঞানগত বিকাশ তার চিন্তা, স্মৃতি, ভাষা, সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আবেগিক বিকাশের মাধ্যমে শিশু নিজের অনুভূতি চিনতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, আর সামাজিক বিকাশ তাকে বন্ধুত্ব গড়তে, নিয়ম মানতে, দলগতভাবে কাজ করতে এবং সমাজের মূল্যবোধ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশ শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, তাকে ইতিবাচক আত্মপরিচয় গঠনে সহায়তা করে এবং ভবিষ্যতের শিক্ষাজীবনের জন্য প্রস্তুত করে। এ ছাড়া পুষ্টি, স্বাস্থ্যের যত্ন ও নিরাপদ পরিবেশ শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক বিকাশেও সরাসরি প্রভাব ফেলে। শিশুর প্রাথমিক বিকাশ শক্তিশালী হলে সে ভবিষ্যতে শিক্ষায়, সামাজিক জীবনে ও কর্মজীবনে ভালো করতে পারে। তাই পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ সকলেরই দায়িত্ব শিশুর জন্য একটি সহায়ক, ভালোবাসাপূর্ণ ও উদ্দীপনামূলক পরিবেশ তৈরি করা, যাতে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ স্বাভাবিক, সুস্থ ও সুষমভাবে সম্পন্ন হতে পারে। একটি শিশুর সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশ কেবল তার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং একটি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

শিক্ষকের করণীয়

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ একটি ধারাবাহিক ও সংবেদনশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে শিক্ষক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একজন দক্ষ শিক্ষক শিশুর বয়সভিত্তিক চাহিদা, বিকাশের ধাপ, শেখার ধরন ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট বুঝে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সঠিক মনোভাব, উপযুক্ত কৌশল এবং শিশুবান্ধব পরিবেশ শিশুর সার্বিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। তাই শিক্ষককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন:

১. শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষ এমনভাবে গুছাতে হবে যাতে শিশু নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ বোধ করে।
২. রঙিন, আকর্ষণীয় ও বয়সোপযোগী শিক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করা।
৩. প্রতিটি শিশুকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও শেখার সুযোগ প্রদান করা।
৪. শিশুর শারীরিক,মানসিক, ভাষাগত ও সামাজিক সক্ষমতা বিবেচনা করে শিক্ষণ উপাদান বা উপকরণ নির্বাচন করা।
৫. ছোট বয়সী শিশুদের জন্য খেলাধুলা-ভিত্তিক শিক্ষণ কার্যক্রম এবং বড়দের জন্য ধাপে ধাপে কাঠামোবদ্ধ শেখার সুযোগ তৈরি করা।
৬. প্রতিটি শিশুর শেখার গতি, আগ্রহ, দক্ষতা ও দুর্বলতা ভিন্ন-শিক্ষককে এ বিষয়টি উপলব্ধি করা।
৭. যেসব শিশুর অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন, তাদের জন্য আলাদা নির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়া।
৮. প্রতিটি শিশুর সফলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা।
৯. শিক্ষককে শিশুদের প্রতি সদয়, ধৈর্যশীল ও উৎসাহব্যঞ্জক আচরণ করা।
১০. ভুল করলে বকাঝকা না করে তাকে শেখার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা।
১১. প্রশংসা, উৎসাহ ও ইতিবাচক আচরণের মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস ও শেখার আগ্রহ বাড়ানো।
১২. প্রশ্ন করা, অনুসন্ধান করা, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা।
১৩. শিশুকে হাতে-কলমে শেখার, দলগতভাবে কাজ করার এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়া।
১৪. শিশুর শারীরিক, মানসিক ও একাডেমিক অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।
১৫. বয়সোপযোগী ও সহজ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে হবে, যাতে শিশু চাপ অনুভব না করে।
১৬. মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষণ পদ্ধতি সমন্বয় করা।
১৭. অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা।
১৮. শিশুর আচরণ, শেখার অগ্রগতি ও প্রয়োজনীয় সহায়তা সম্পর্কে অভিভাবককে অবহিত করা।
১৯. অভিভাবকদের শিক্ষক হিসেবে নয় বরং অংশীদার হিসেবে যুক্ত করা।
২০. শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুর শারীরিক নিরাপত্তার জন্য উপযোগী কিনা তা নিশ্চিত করা।
২১. শিশুকে নিরাপদ আচরণ, স্বাস্থ্যবিধি ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শেখানো।
২২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২৩. শেখার উপকরণ, কার্যক্রম ও আচরণে বৈষম্যহীন পরিবেশ নিশ্চিত করা।
২৪. শিক্ষককে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও পাঠ্যক্রমভিত্তিক নির্দেশনা গ্রহণের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
২৫. আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি, প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আপডেট থাকা।

একজন শিক্ষক কেবল জ্ঞানদানকারী নন; তিনি শিশুর বিকাশের পথপ্রদর্শক। ভালোবাসা, ধৈর্য, সহমর্মিতা, পরিকল্পিত শিক্ষণ ও সহযোগিতামূলক আচরণের মাধ্যমে তিনি শিশুর সার্বিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করেন এবং ভবিষ্যতের একজন আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্ববান ও মানবিক নাগরিক গড়ে তুলতে সহায়তা করেন।

পরিবারের করণীয়

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করতে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর থেকে প্রতিটি ধাপে পরিবারই শিশুর প্রথম স্কুল, প্রথম শিক্ষক এবং প্রথম নিরাপদ আশ্রয়। পরিবারের সঠিক দিকনির্দেশনা, যত্ন, ভালোবাসা, আচরণ ও যোগাযোগ শিশুর ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ, ভাষা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক দক্ষতা এবং শেখার ভিত্তি গড়ে তোলে। তাই শিশুর সার্বিক বিকাশে অভিভাবকদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন-

১. শিশুর জন্য ঘরকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সে নিরাপদ, ভালোবাসাপূর্ণ ও মানসিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। মারধর, বকাঝকা, ভয় দেখানো বা অপমান নয় বরং স্নেহ, ধৈর্য ও উৎসাহের মাধ্যমে তাকে পথ দেখানো প্রয়োজন।

২. পর্যাপ্ত ও সুষম খাবার, পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানি, টিকাদান, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং পর্যাপ্ত ঘুম শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করে।

৩. শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, তার অনুভূতিকে মূল্য দেওয়া, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং তাকে মুক্তভাবে কথা বলতে উৎসাহিত করা তার ভাষাগত, আবেগিক ও সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

৪. খেলাধুলা শিশুর চিন্তা, সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি, সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক দক্ষতা বাড়ায়। তাই পরিবার থেকে বয়সোপযোগী খেলনা, নিরাপদ খেলার পরিবেশ এবং খেলার সময় নিশ্চিত করা জরুরি।

৫. গল্প শোনা, বই দেখা, ছবি বর্ণনা করা বা একসঙ্গে পড়ার অভ্যাস শিশুর ভাষা, শব্দভান্ডার, মনোযোগ ও কল্পনাশক্তি সমৃদ্ধ করে। ঘরে এমন পরিবেশ তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬. শিশুরা বড়দের আচরণ অনুকরণ করে। তাই অভিভাবকদের উচিত শিষ্টাচার, সম্মান, সহযোগিতা, সততা, ধৈর্য, পরিচ্ছন্নতা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা এই গুণগুলো নিজের আচরণের মাধ্যমে শিশুকে দেখানো ও শেখানো। এতে শিশুর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ভালো গুণ গড়ে ওঠে।

৭. টেলিভিশন বা মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার সীমিত রাখা, পড়ার ও শেখার জন্য শান্ত পরিবেশ তৈরি করা, শিশুকে তার নিজের গতিতে শিখতে উৎসাহ দেয়া, এসবই তার জ্ঞানীয় বিকাশকে সহায়তা করে।

৮. বয়সোপযোগী ছোট দায়িত্ব যেমন নিজের জিনিস গুছানো, সহজ কাজ করা এসব শিশুর আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ায়।

৯. শিশুকে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে শেখানো, দুঃখ বা রাগ হলে তাকে শান্ত করা, বুঝিয়ে বলা এবং তার মানসিক চাহিদাকে সম্মান করা, এসবের মাধ্যমে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।

১০. ভয়, মারধর বা অপমান না করে নিয়ম ব্যাখ্যা করা, কারণ বোঝানো, বিকল্প আচরণ শেখানো এবং নিয়মিতভাবে ইতিবাচক উৎসাহ দেওয়া শিশুর আচরণগত বিকাশে অত্যন্ত কার্যকর।

১১. প্রতিটি শিশু ভিন্ন, তার দক্ষতা, গতি ও আগ্রহও ভিন্ন। তাই তুলনা না করে তার নিজস্ব প্রতিভা চিহ্নিত ও বিকশিত করার জন্য পরিবারকে সচেষ্ট হতে হবে।

১২. শিক্ষকের সাথে নিয়মিত কথা বলা, শিশুর অগ্রগতি, আচরণ বা বিশেষ সহায়তার বিষয়ে জানা-এসবের মাধ্যমে শিশুর শেখা ও বিকাশে পরিবার ও বিদ্যালয় একটি দল হিসেবে কাজ করতে পারে।

১৩. বাড়ির বাইরের নিরাপত্তা, অপরিচিত ব্যক্তির সাথে সতর্কতা, স্বাস্থ্যবিধি, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এসব বিষয়ে অভিভাবকদের তাদের শিশুদের নিয়মিত শিক্ষা ও অনুশীলন করাতে হবে।

১৪. যদি শিশুর শারীরিক বা মানসিক উন্নয়নগত সমস্যা বা বিশেষ চাহিদা থাকে, তবে অভিভাবকদের বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া, প্রয়োজনীয় থেরাপি প্রদান এবং বাড়িতে বিশেষ যত্ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

পরিবারের সঠিক পরিচর্যা, ভালোবাসা, নিরাপত্তা, নিয়মিত যোগাযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, বয়সোপযোগী শেখা ও খেলার

সুযোগএসবই শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধি ও বিকাশের মূল ভিত্তি। পরিবারই শিশুর জীবনে প্রথম শিক্ষক, তাই পরিবারের সচেতনতা ও সক্রিয় ভূমিকা একজন শিশুকে আত্মবিশ্বাসী, মানবিক ও পরিণত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে।

শিশুর বিকাশ ও শিখনের ক্ষেত্রসমূহ

শিশুর বিকাশ একটি ধারাবাহিক ও সর্বাঙ্গীণ প্রক্রিয়া, যেখানে শারীরিক, সামাজিক-আবেগিক, ভাষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সব ক্ষেত্রই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। জন্মের পর থেকেই শিশু পরিবার, পরিবেশ ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে শুরু করে, যা তার পরবর্তী শিক্ষাজীবনের ভিত্তি তৈরি করে। বাংলাদেশে শিশুর বিকাশকে কাঠামোবদ্ধ ও মানসম্মত করতে বিকাশের ক্ষেত্র নির্ধারণের পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট শিখনক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব শিখনক্ষেত্র শিশুদের বয়সোপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করে।

বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশে শিশুর বিকাশ ও প্রারম্ভিক শিখনকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর অধীনে নিয়ে আসার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ইউনিসেফের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় "বাংলাদেশ শিশু একাডেমি" ২০২০ সালে **'প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান** (Early Learning and Development Standards-ELDS ২০২০)**'** প্রণয়ন করে। এই মানদণ্ডে জন্ম থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিকাশকে চারটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্র শিশুর বয়সভেদে কী কী আচরণ, দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন করবে তার ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়। চারটি ক্ষেত্র নিচে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

১) শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতার বিকাশ

শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতার বিকাশ বলতে শিশু কীভাবে নিজের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে শেখে, সমন্বয় করে এবং ধীরে ধীরে শক্তি, গতি, ভারসাম্য ও সূক্ষ্ম দক্ষতা (fine motor skills) আয়ত্ত করে তা বোঝায়। এই বিকাশক্ষেত্রটি শিশুর দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন, খেলাধুলা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং নিরাপদ শারীরিক আচরণ শেখার ভিত্তি তৈরি করে।

এই ধরণের বিকাশে শিশু,

- হামাগুড়ি দেওয়া, দাঁড়ানো, হাঁটা, দৌড়ানো, লাফানো ও উঠানামার মতো পেশীজ (gross motor) কাজগুলো করতে শিখে।
- আঙুলের সাহায্যে ছোট জিনিস ধরা, আঁকিবুকি করা, পাজল মেলানো, জামার বোতাম লাগানো এসব সূক্ষ্ম পেশীজ কাজগুলো করে।
- নিজে নিজে খেতে পারা, পানি পান করা, হাত-মুখ ধোয়া, টয়লেট ব্যবহার করা এসব দৈনন্দিন কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জন করে।

উদাহরণস্বরূপ দৌড়ানো, লাফানো, বল নিক্ষেপের মতো খেলায় অংশ নেওয়ার সময় শিশুর শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতার বিকাশ সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ হয়। এ ছাড়া শরীরচর্চা, খেলা-কেন্দ্রিক শিক্ষা এবং নিরাপদ শারীরিক পরিবেশ এ বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

২) সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ

সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ হলো শিশুর নিজের অনুভূতি বুঝতে শেখা, তা নিয়ন্ত্রণ করা, অন্যের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে মেলামেশা করা এবং সামাজিক নিয়ম-কানুন শিখে নেওয়ার প্রক্রিয়া। এ বিকাশ শিশুকে ভবিষ্যতে আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্বশীল ও সামাজিকভাবে দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

এই ধরণের বিকাশে শিশু,

- পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে।
- সহানুভূতি, সহযোগিতা, ভাগাভাগি ও পালাক্রমে কাজ করা শিখে।
- নিজের রাগ, ভয়, দুঃখ, আনন্দের মতো আবেগগুলো চেনে ও নিয়ন্ত্রণ করে।
- দলগতভাবে খেলা, নিয়ম মানা ও মতবিরোধ সমাধানের সক্ষমতা অর্জন করে।

উদাহরণস্বরূপ বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় অংশ নিয়ে নিয়ম মেনে খেলা, অন্যকে সাহায্য করা, অভিমানে কান্না থামিয়ে আবার খেলায় ফিরে আসা এসব আচরণই শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশকে প্রতিফলিত করে।

৩) ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ

ভাষা ও যোগাযোগের বিকাশ হলো শিশুর কথা বলা, শোনা, বোঝা, পড়া ও লেখার দক্ষতা এবং যোগাযোগের নিয়মকানুন সঠিকভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতা।

এই ধরণের বিকাশে শিশু,

- শব্দের অর্থ বোঝা, বাক্য গঠন করা ও সঠিকভাবে নিজের চাহিদা প্রকাশ করে।
- প্রশ্ন করা, গল্প বলা, গানের লাইন অনুসরণ করতে পারে।
- বই হাতে নিয়ে পাতা উল্টানো, ছবি দেখে ধারণা করা ও অক্ষর চিনতে শিখে।
- ধ্বনিগত সচেতনতা বাড়ে যা ভবিষ্যতে পড়া-লেখা শেখার ভিত্তি তৈরি করে।

উদাহরণস্বরূপ শিশুর সঙ্গে গল্প করা, ছড়া শেখানো, গান গাওয়া, ছবি দেখে কথা বলা এসব কার্যক্রম তার ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতাকে দ্রুত উন্নত করে।

৪) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ

বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানগত বিকাশ হলো শিশুর চিন্তা করার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধান, যুক্তি প্রয়োগ, গাণিতিক ধারণা, পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান ও সৃজনশীলতা ব্যবহারের দক্ষতা।

এই ধরণের বিকাশে শিশু,

- আকার, রং, সংখ্যা, মাপ, সময় সম্পর্কিত ধারণা বোঝে।
- মিল খুঁজে বের করা, পাজল সমাধান করা, তুলনা করতে পারে।
- কারণ-ফলাফল (cause-effect) সম্পর্ক বোঝে।
- নতুন পরিস্থিতিতে নিজের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে শিখে।

উদাহরণস্বরূপ ছবি দেখে মিল খুঁজে বের করা, খেলার ব্লক দিয়ে কাঠামো বানানো, সংখ্যা চেনা, ছোট সমস্যা সমাধান করা এসবই শিশুর জ্ঞানগত বিকাশকে এগিয়ে নেয়।

শিখনের ক্ষেত্রসমূহ

শিশুর বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। প্রতিটি শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে তার শারীরিক, সামাজিক-আবেগিক, ভাষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক এই চার ধরনের বিকাশের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হয়। জন্ম থেকেই শিশুরা পরিবার,

আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, খেলার সাথী ও সমাজ থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন জ্ঞান ও আচরণ শিখে বিকাশের একটি ধাপে উন্নীত হয়। বাংলাদেশের শিশুদের যেহেতু বিদ্যালয়যাত্রা শুরু হয় সাধারণত ৪+ বছর বয়সে, তাই তাদের বয়স উপযোগী শিখন নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট কিছু শিখনক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক স্তরে (৪+ ও ৫+ বয়সী শিশু) শিখনের বিষয়গুলোকে ৯টি শিখনক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে, যাতে শিশুর বিকাশের ভিত্তি মজবুত হয়। অপরদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (পরিমার্জিত ২০২৫) অনুযায়ী প্রাথমিক (৬+ থেকে ১০+ বয়সী শিশু) থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ১০টি শিখনক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি চার ধরণের বিকাশেও পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। একটি শিশুর বিকাশ কখনোই এককভাবে ঘটে না; বরং প্রতিটি ক্ষেত্র পরস্পরকে প্রভাবিত করে। কোনো এক ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে তা অন্য ক্ষেত্রের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুর সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রমে এই শিখনক্ষেত্রগুলো সংযোজন করা হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে শেখার মাধ্যমে তার বিকাশ সাধিত হবে। তাই এসকল শিখনক্ষেত্রের অধীনে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ও দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেগুলো বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতে চর্চার মাধ্যমে শিশু বিকাশের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে বলে আশা করা যায়।

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের ৯টি শিখনক্ষেত্র

১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা

- ব্যায়াম, দৌড়ানো, লাফানো, ভারসাম্য রাখা, সূক্ষ্ম পেশীজ দক্ষতা (কলম ধরা, ইরেজার, কাঁচি ব্যবহার, ব্লক সাজানো), শরীরচর্চা, বিভিন্ন ধরণের খেলা ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২. সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ

- মিলেমিশে থাকা, সুবিধা-অসুবিধা ও পছন্দ-অপছনের প্রকাশ, বন্ধু তৈরি, দলগত খেলা ও কাজ, নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ, অন্যের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৩. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

- মিলেমিশে থাকা ও সহযোগিতা করা, সত্য কথা বলা, ভালো কাজ করা, রীতিনীতি জানা ও অনুসরণ করা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, দায়িত্ববোধ তৈরি, বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৪. ভাষা ও যোগাযোগ

- কথা বলা, শোনা, শব্দভান্ডার বৃদ্ধি, ছড়া ও গল্প বলা, গান গাওয়া, ছবি দেখে বলা, অক্ষর চেনা, প্রাক পঠন ও লিখন ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৫. গণিত ও যুক্তি

- সংখ্যা চেনা ও গণনা, আকার, তুলনা, পরিমাপ, প্যাটার্ন, লম্বা-ছোট, ভারী-হালকা, কম-বেশি, সময়ের ধারণা, দিন-রাত, সকাল-বিকাল, শ্রেণিবিন্যাস, যোগের ধারণা, বিয়োগের ধারণা, সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক ধারণা ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা

- আঁকা, রং করা, হস্তশিল্প, গান, নাচ, অভিনয়, গল্প শোনা, বলা, বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি, সৌন্দর্যবোধ, বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার (মাটি, কাগজ, রঙ) ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৭. পরিবেশ ও জলবায়ু

- প্রকৃতির প্রতি যত্ন, বাড়ি-বিদ্যালয়-পরিবেশের যত্ন, ঋতুচক্র, আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা, পানি, বায়ু, মাটি সম্পর্কে সচেতনতা, জীবজগত ও প্রকৃতির ধারণা ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- দৈনন্দিন বিজ্ঞান, সহজ প্রযুক্তির প্রয়োগ, খেলনা-উপকরণ ব্যবহার, সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রযুক্তির পরিচয় (ঘড়ি, ফোন, গৃহস্থ যন্ত্রপাতি), জীব ও জড়ের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস (হাত ধোয়া, দাঁত ব্রাশ), স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিরাপত্তার নিয়ম (রাস্তায় চলা, আগুন/বিদ্যুৎ থেকে সতর্কতা), সুরক্ষা, আবেগ বুঝা ও নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের ১০টি শিখনক্ষেত্র

প্রাক-প্রাথমিকের মতই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যেও শিখনক্ষেত্রের অধীনে নির্দিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক বিকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে আসছেন।

ক্রমিক নং	শিখনক্ষেত্র	প্রাথমিক স্তরের বিষয়
১.	ভাষা ও যোগাযোগ	বাংলা
		ইংরেজি
২.	গণিত ও যুক্তি	গণিত
৩.	জীবন ও জীবিকা	প্রাথমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত
৪.	সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব	সামাজিক বিজ্ঞান
৫.	পরিবেশ ও জলবায়ু	প্রাথমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত
৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বিজ্ঞান
৭.	ডিজিটাল প্রযুক্তি	বিজ্ঞান বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত
৮.	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা
৯.	মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	ধর্ম শিক্ষা ও ক্রস কাটিং হিসেবে অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত
১০.	শিল্প ও সংস্কৃতি	শিল্পকলা

শিশুর প্রাথমিক বিকাশকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে এই শিখনক্ষেত্রভিত্তিক শিখন শেখানো কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকর ও প্রয়োজনীয়। প্রাক-প্রাথমিকের নয়টি এবং প্রাথমিকের দশটি শিখনক্ষেত্র শিশুকে শুধু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানই দেয় না, বরং তার চার ধরণের (শারীরিক, সামাজিক-আবেগিক, ভাষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক) বিকাশকে সমানভাবে এগিয়ে নেয়। বিদ্যালয় ও পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এসব শিখনক্ষেত্রে নির্ধারিত কার্যক্রম নিয়মিত চর্চা করা হলে শিশুর শেখা আরও আনন্দদায়ক, অর্থবহ এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফলে একটি শিশু আগামীতে আত্মনির্ভর, দায়িত্বশীল, জিজ্ঞাসু ও সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও শিখন

মানব জীবনের বিকাশ শুরু হয় মাতৃগর্ভেই। গর্ভাবস্থা থেকে শিশুর মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলোর গঠন শুরু হয়। এই কারণেই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি (ECCD Policy ২০১৩)' গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবকাল হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বলতে শিশুর জন্ম থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ে তার শারীরিক, মানসিক, জ্ঞানীয়, ভাষাগত, সামাজিক ও আবেগিক সক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধি, পরিবর্তন ও পরিপক্ব হওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এই সময়েই শিশুর সার্বিক বিকাশের ভিত্তি গড়ে ওঠে। প্রারম্ভিক শিখন বলতে শিশুর জীবনের এই সময়গুলোতে খেলা, অনুসন্ধান, অনুকরণ, যোগাযোগ ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এই শিখন স্বাভাবিকভাবে ঘটে এবং পরিবার ও পরিবেশ এর উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। Early Learning and Development Standards-ELDS ২০২০ অনুযায়ী শিশুর বিকাশ ও শিখন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যেখানে একটি দক্ষতা আরেকটির ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ, শিশু আগে ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে অন্বেষণ করতে শেখে, পরে তা থেকে জ্ঞান অর্জন করে, তারপর ধীরে ধীরে ভাষা ব্যবহার, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সমস্যা সমাধান, আত্মনিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও শিখনের গুরুত্ব

প্রারম্ভিক শৈশবকালকে মানবজীবনের "স্বর্ণযুগ" বলা হয়। কারণ এই সময়টিতেই শিশুর মস্তিষ্ক, তার অনুভূতি, আচরণ এবং শারীরিক সক্ষমতার দ্রুততম বিকাশ ঘটে। এ সময়ে শিশু যদি যথাযথ যত্ন এবং উপযুক্ত উদ্দীপনা না পায়, তবে পরবর্তীতে চেষ্টা করলেও তার সার্বিক বিকাশ সংশ্লিষ্ট গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, সামাজিক আচরণ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, ভাষা দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাগুলো এই সময়ের অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করে। তাই প্রারম্ভিক শৈশবকালকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১. শিশুর জন্ম থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে তার মস্তিষ্কে কোটি কোটি স্নায়ু-সংযোগ তৈরি হয়। এই সময়ে শিশুর ভাষা, চিন্তাশক্তি, মনোযোগ, স্মৃতি এবং অনুভূতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাবা-মা ও যত্নকারী শিশুর সাথে কথা বললে, গল্প করলে বা গান শোনালে, শিশুর সাথে খেলা করলে, শিশুর মস্তিষ্ক আরও সক্রিয় হয়। প্রতিটি নতুন শব্দ, নতুন খেলা বা নতুন অভিজ্ঞতা তার সৃজনশীলতা এবং শেখার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলে।

২. প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতাই শিশুর ভবিষ্যৎ শেখার ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি। এই সময়ে শিশুর ভাষা শেখার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, যুক্তি ব্যবহার এবং সামাজিক আচরণ গড়ে ওঠে। যদি শিশুকে সঠিক সময়ে সঠিক উদ্দীপনা বা যত্ন দেওয়া হয় যেমন ছোট ছোট ধাঁধা বলা, গল্প বা খেলাধুলা করা তাহলে তার শেখার যাত্রা সহজ এবং মসৃণ হয়।

৩. শিশু এই সময়ে আবেগিক নিরাপত্তা, স্নেহ, বিশ্বাস এবং সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো বুঝতে শিখে। বাবা-মা ও যত্নকারীর সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক শিশুর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। এর ফলে শিশুর সামাজিক আচরণ উন্নত হয় এবং ভবিষ্যতে সে সুস্থ ও স্থিতিশীল সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়।

৪. শিশুর প্রথম অভিজ্ঞতা তার আচরণ, স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। ভালোবাসা, প্রশংসা, শাসন, নিরাপত্তা এবং নিয়মিত অভ্যাস এইসব বিষয় শিশুর মানসিক গঠনকে দৃঢ় করে। প্রারম্ভিক সময়ে প্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের উদাহরণ শিশুর চরিত্র, মানসিক স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. শিশুর শারীরিক বিকাশও এই সময়ে ঘটে। পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্যসম্মত পরিচর্যা, টিকাদান এবং নিরাপদ পরিবেশ শিশুর দেহকে সুস্থ রাখে। এই সময়ে শিশুর পেশীজ দক্ষতা যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, ধরার ক্ষমতা সবই ভালোভাবে বিকশিত হয়। সুস্থ শরীর ও মন শিশুর কৌতূহল, খেলাধুলা এবং শেখার আগ্রহকে আরও শক্তিশালী করে।

৬. গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু প্রারম্ভিক বিকাশের পর্যাপ্ত সহায়তা পায় তাদের শিক্ষা জীবনে সাফল্য বেশি, সামাজিক দক্ষতা বেশ উন্নত, মানসিক স্থিতিশীলতা দৃঢ় এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের প্রবণতা কম থাকে।

প্রারম্ভিক বিকাশ একটি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি ধাপকে প্রভাবিত করে। তাই এই সময়ে শিশু যাতে ভালোবাসা, যত্ন, পুষ্টি, খেলাধুলা, নিরাপদ পরিবেশ এবং স্নেহপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে বেড়ে ওঠে তা নিশ্চিত করা জরুরি। এই মূল ভিত্তিই শিশুর সারাজীবনের উন্নয়নকে দৃঢ় করে তোলে।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও শিখনে পরিবার ও বিদ্যালয়ের করণীয়

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশু প্রথম থেকেই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, এবং এই সম্পর্ক তার ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও আবেগিক বিকাশে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। তাই পরিবারের সদস্যদের শিশুর প্রতি নিয়মিত স্নেহ, ভালোবাসা এবং যত্ন প্রদর্শন করা উচিত। শিশু যাতে নিরাপদ, স্নেহময় এবং উদ্দীপনামূলক পরিবেশে থাকে, তা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সঙ্গে আলাপচারিতা করা, গল্প বলা, গান শোনানো এবং খেলার মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা দেয়া ইত্যাদি কাজগুলো করা যায়। এছাড়া শিশুর আবেগ, ভয়, দুঃখ বা আনন্দকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করা এবং তার অনুভূতিকে সমর্থন করা জরুরি। শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করতে পরিবারের সদস্যদের অবশ্যই সুষম খাদ্য, পর্যাপ্ত ঘুম, পরিচ্ছন্নতা এবং নিয়মিত টিকাদান নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলা, হাঁটা-দৌড়ানো এবং সহজ ব্যায়ামের মাধ্যমে শিশুর শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পরিবার যেখানে শিশুকে নিরাপদ, স্নেহ এবং উদ্দীপনামূলক পরিবেশ দেয়, সেখানে শিশুর আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

বিদ্যালয়ও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় হলো সেই স্থান যেখানে শিশু নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, বন্ধু ও শিক্ষকের সঙ্গে মেলামেশা শেখে এবং সমন্বয়, ভাগাভাগি ও সমস্যা সমাধানের মতো সামাজিক দক্ষতাগুলো অর্জন করে। শিক্ষকরা শিশুর শেখার আগ্রহ ও কৌতূহলকে উদ্দীপিত করার জন্য রঙিন বই, ধাঁধা, গল্প, সৃজনশীল খেলাধুলা এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক কার্যক্রম ব্যবহার করতে পারেন। মূলত প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ এসব উপকরনের সন্নিবেশে সাজানো থাকে। শিশু যাতে নতুন কিছু শেখার প্রতি আগ্রহী থাকে এবং নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সৃজনশীল, নিরাপদ এবং উৎসাহজনক হতে হবে। পাশাপাশি শিশুদের আবেগিক বিকাশের দিকে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকরা তাদের ধৈর্য, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দলের সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। এছাড়া বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, খেলাধুলার সুযোগ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য পরিবার এবং বিদ্যালয় একে অপরের পরিপূরক। পরিবার যেখানে শিশুকে স্নেহ, নিরাপত্তা এবং ঘরোয়া উদ্দীপনা দেয়, সেখানে বিদ্যালয় শিশুর সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষামূলক বিকাশ নিশ্চিত করে। যদি পরিবার ও শিক্ষক মিলিতভাবে শিশুর প্রতি সঠিক যত্ন, স্নেহ, পুষ্টি, নিরাপদ পরিবেশ, খেলার সুযোগ এবং শিক্ষামূলক উদ্দীপনা প্রদান করে, তবে শিশুর মস্তিষ্ক, ব্যক্তিত্ব, আচরণ এবং সামাজিক দক্ষতা সব দিক থেকে সুস্থভাবে বিকশিত হয়। এটি শিশুর আত্মবিশ্বাসী, সৃজনশীল এবং সফল জীবনের জন্য সবচেয়ে শক্ত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

শিশুর বিকাশে খেলা

সকল শিশুর জন্য খেলাধুলা একটি সহজাত বিষয়। জাতি, বর্ণ বা ধর্ম নির্বিশেষে শিশুরা খেলা করতে স্বাভাবিকভাবে আগ্রহী। খেলা হলো শিশুর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, যেখানে শিশু স্বেচ্ছায় আনন্দ এবং আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুর সমস্ত প্রাণশক্তি প্রকাশ পায়, এবং এটি শিশুকে তার চারপাশের মানুষ, পরিবেশ এবং নিজের সম্পর্কে শেখায়।

শিশুর জীবনে খেলা শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয় বরং শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মূল ভিত্তি। খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১। খেলা সহজাত। শিশু তার নিজের মধ্যেই খেলার প্রেরণা অনুভব করে এবং স্বাভাবিকভাবে এতে অংশগ্রহণ করে। খেলায় শিশুর অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং আনন্দময়, যা খেলাকে শিশুর জন্য অর্থপূর্ণ করে তোলে।

২। খেলা প্রায়শই প্রতীকী বা কল্পনাপ্রসূত হয়। অনেক সময় শিশু মিছিমিছি বা রোল প্লে খেলে। যেমন তারা রান্না করার ভঙ্গি করে, খালি বাক্সকে গাড়ি হিসেবে ব্যবহার করে বা ডাক্তার-রোগী খেলার মাধ্যমে অন্যকে অনুকরণ করে খেলে।

৩। শিশুরা প্রায়শই খেলার নিয়ম নিজেরা ঠিক করে। শিশুদের খেলা সবসময় আনন্দদায়ক। এটি শিশুর আবেগ, অনুভূতি এবং ভাব প্রকাশের একটি মাধ্যম। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু নিজেকে প্রকাশ করতে, কল্পনা শক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশ করতে সক্ষম হয়।

৪। খেলা শেখার স্বাভাবিক মাধ্যম। খেলার মাধ্যমে শিশু তার চারপাশের জগৎকে চিনে, নতুন দক্ষতা অর্জন করে এবং কারণ-ফলাফল সম্পর্কে বুঝতে শেখে। খেলায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিশুর ভাষা, সামাজিক যোগাযোগ, সমস্যা সমাধানসহ বিভিন্ন বিকাশক্ষেত্র সমৃদ্ধ হয়।

৫। খেলা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বাড়ায়। খেলার সময় শিশু অন্য শিশু বা বড়দের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সহযোগিতা করা, ভাগাভাগি করা এবং একসঙ্গে কাজ করার মতো সামাজিক আচরণগুলো শিখে। ফলে খেলা শিশুর সামাজিক দক্ষতা ও সম্পর্ক গঠনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

শিশুর খেলার ধরণ

সমাজবিজ্ঞানী মিলড্রেড পার্টেন (Mildred Parten) ১৯৩২ সালে পরিচালিত তার গবেষণায় দেখান যে, শিশুরা বয়স ও বিকাশগত পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণের ধরন পরিবর্তন করে। খেলায় এই পরিবর্তনগুলো শিশুর সামাজিক দক্ষতা, সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং পারস্পরিক আচরণ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পার্টেনের মতে, শিশুর সামাজিক বিকাশ ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ধরণ অনুসারে শিশুর খেলার ধরণকে মোট ছয়টি ধাপে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। যথা-

১. উদ্দেশ্যহীন খেলা (Unoccupied Play)

এই পর্যায়ে শিশু কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়াই নড়াচড়া করে, তাকায় বা পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে। খেলার মতো না দেখালেও এটি শিশুর পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা ও ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা বাড়ানোর একটি স্বাভাবিক ধাপ।

২. একাকী খেলা (Solitary Play)

এই ধাপে শিশু একা নিজস্ব খেলনা বা বস্তু নিয়ে খেলা করে এবং অন্য শিশুদের প্রতি তেমন মনোযোগ দেয় না। শিশুর স্বনির্ভরতা, মনোযোগ ক্ষমতা ও নিজের মতো করে শেখার প্রবণতা এই সময় শক্তিশালী হয়।

৩. পর্যবেক্ষণমূলক খেলা (Onlooker Play)

শিশু অন্যদের খেলা মনোযোগ দিয়ে দেখে, মন্তব্য করে বা আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু সরাসরি অংশগ্রহণ করে না। অনুকরণ করা, সামাজিক নিয়ম বোঝা এবং যোগাযোগ দক্ষতার সূচনা এই ধাপে দেখা যায়।

৪. সমান্তরাল খেলা (Parallel Play)

এখানে শিশু একই পরিবেশে, একই ধরনের খেলনা নিয়ে পাশে পাশে খেলে, তবে একে অপরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বা সহযোগিতা কম থাকে। সামাজিক খেলায় প্রবেশের আগে এটি একটি সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করে।

৫. মিথস্ক্রীয়ামূলক খেলা (Associative Play)

এই পর্যায়ে শিশুরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলে, খেলনা ভাগ করে এবং একই কার্যক্রমে অংশ নেয়, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট যৌথ উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা থাকে না। সামাজিক যোগাযোগ, ভাগাভাগি এবং বন্ধুত্ব তৈরির শুরু এখানে লক্ষণীয়।

৬. সহযোগিতামূলক খেলা (Cooperative Play)

এটি সবচেয়ে উন্নত ধাপ যেখানে শিশুরা একসঙ্গে পরিকল্পনা করে, ভূমিকা বণ্টন করে এবং একটি যৌথ লক্ষ্য নিয়ে খেলে। দলগত কাজ, নিয়ম মানা, নেতৃত্ব, সহযোগিতা এই ধাপেই গড়ে ওঠে।

শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির খেলাসমূহ

ভিতরে খেলা	বাইরে খেলা
১. রেলগাড়ি ঝিক ঝিক	১. ফুল টোকা
২. কাকে তুমি বন্ধু চাও?	২. কানামাছি ভোঁ ভোঁ
৩. রাজা-রানি খেলা	৩. ইঁদুর বিড়াল
৪. রহস্য ভরা থলে	৪. গুটি নিয়ে ঘরে আসি
৫. পাখি উড়ে	৫. ইচিং বিচিং
৬. তোমরা কি সব বলতে পার	৬. আকৃতি বানাই
৭. আয়না	৭. গুপ্তধন লুকানো
৮. রং ছোঁয়া	৮. জাল ও মাছ
৯. যত পারো তুলে নাও	৯. নৌকা নিয়ে খেলা
১০. বর্ণ চেনার উপায়	১০. ব্যাঙ লাফ

বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা এবং সার্বিক বিকাশ লাভ ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। প্রত্যেক শিশুরই স্বকীয়তা ও শেখার নিজস্ব ধরন রয়েছে। এসব খেলা শিশুর স্বকীয়তা বজায় রেখে সৃজনশীলতা প্রকাশের একটি অন্যতম পদ্ধতি। এ ধরনের খেলার মাধ্যমে শিশু একাকী কিংবা অন্য শিশুর সঙ্গে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী যা কিছু করতে চায় বা খেলতে চায় তাই করার সুযোগ পায়। এসকল খেলার মাধ্যমে শিশুরা একে অপরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়া শেখে। এছাড়া শিশুরা নিজে নিজে অথবা অন্যের সাহায্যে কাজ করতে শেখে। এভাবে শিশুরা তাদের পছন্দমতো খেলার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা, আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ পায়। এই খেলাগুলো শিশুর যেসব দক্ষতা অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে সেগুলো হলো- সৃজনশীলতা, আত্মসচেতনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কল্পনাশক্তি, সক্রিয় অংশগ্রহণ, আবেগ অনুভূতির প্রকাশ, আত্মবিশ্বাস, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, সহযোগিতার মানসিকতা ইত্যাদি।

পরিবারের করণীয়: খেলার মাধ্যমে শিশুর বিকাশ

পরিবার শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে খেলার মাধ্যমে পরিবার সরাসরি সহায়তা করতে পারে। প্রথমে, পরিবারের দায়িত্ব হলো শিশুদের জন্য নিরাপদ ও উৎসাহমূলক খেলার পরিবেশ নিশ্চিত করা। এতে শিশু স্বাধীনভাবে খেলতে পারে এবং নিজের সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তি

বিকাশ করতে পারে। পিতামাতা খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করলে শিশুর খেলার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। পরিবার শিশুদের খেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে। বাবা-মা তাদের সঙ্গে খেলায় যুক্ত হয়ে শিশুদের উদ্দীপনা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে পারেন। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক বিকাশকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। নিয়মিত শারীরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর স্থূল ও সূক্ষ্ম পেশীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ভারসাম্য ও সমন্বয় উন্নত হয় এবং সুস্থ শরীর গড়ে ওঠে।

শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশেও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুকে সহযোগিতা, দলগত কাজ, দায়িত্ব ভাগাভাগি, ধৈর্য, জয় ও পরাজয় মেনে নেওয়া শেখানো যায়। এতে শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে খেলার মাধ্যমে শিশুর ভাষা ও যোগাযোগের দক্ষতা বিকশিত হয়। গল্প বলার খেলা, ভূমিকা নির্ভর খেলা বা সহযোগিতামূলক খেলা শিশুদের নতুন শব্দ শেখার, প্রশ্ন করার, অন্যের কথা বোঝার এবং নিজ ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

পরিবার শিশুর সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। খেলাধুলার সময় শিশুকে নতুন ধারণা তৈরি এবং বাস্তব পরিস্থিতি অনুকরণ করার সুযোগ দিলে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং নতুন সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়। এছাড়া বাবা-মা শিশুদের আবেগ বোঝার মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে এবং তাদেরকে ইতিবাচক আচরণ অনুশীলন করতে সাহায্য করেন। এভাবে, পরিবারের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহমর্মিতা শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করে এবং খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু এক সুস্থ, সৃজনশীল ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে বড় হতে পারে।

শিক্ষকের করণীয়: খেলার মাধ্যমে শিশুর বিকাশ

শিশুর খেলার মাধ্যমে শিক্ষাকে আকর্ষণীয়, সৃজনশীল এবং কার্যকর করতে শিক্ষকের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের দায়িত্ব শুরু হয় শিশুর শারীরিক বিকাশের সহায়তা দিয়ে। শিক্ষক শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শারীরিক খেলার ব্যবস্থা করে, যেমন বল খেলা, দড়ি লাফানো, দোলনা বা অন্যান্য কার্যক্রম। এসব খেলার মাধ্যমে শিশু সক্রিয় থাকে, শরীরের স্থুল ও সূক্ষ্ম পেশি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং শারীরিক সক্ষমতা ও ভারসাম্য উন্নত হয়। শারীরিক সীমাবদ্ধতা সম্পন্ন শিশুর জন্য বিশেষ ধরনের খেলার ব্যবস্থা করা হলে তারাও খেলায় অংশ নিতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসী হতে পারবে।
শিক্ষকরা শিশুর জন্য নিরাপদ ও উপযুক্ত খেলার পরিবেশ নিশ্চিত করেন। বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন বল, পাজল, পুতুল, রং ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করলে শিশুরা খেলাধুলার সময় কোনো আঘাতপ্রাপ্তির ভয় ছাড়া স্বাধীনভাবে অংশ নিতে পারে। এছাড়া শিক্ষকের দায়িত্ব শিশুদের জন্য খেলা ভিত্তিক কার্যক্রম তৈরি করা, শিক্ষণমূলক খেলার আয়োজন করা এবং তাদের সমস্যা সমাধান ও নতুন ধারণা শেখার সুযোগ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, সংখ্যা শেখানোর জন্য ব্লক ব্যবহার করা, রঙ ও আকার শেখানোর জন্য খেলা আয়োজন করা, এবং ভূমিকা নির্ভর খেলার মাধ্যমে বাস্তব জীবনের কাজ বা চরিত্র অনুকরণ করানো।

শিক্ষকরা খেলাধুলার সময় শিশুদের আচরণ ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। এর মাধ্যমে শিশুর শক্তি ও দুর্বলতা বোঝা যায় এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম সাজানো সম্ভব হয়। প্রয়োজনে শিশুদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় এবং উৎসাহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শিশু খেলায় অংশগ্রহণে দ্বিধা দেখায়, তাকে ধৈর্যসহকারে উৎসাহিত করা হয়। একই সঙ্গে শিশুকে স্বাধীনভাবে খেলতে সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তাদের সৃজনশীলতা এবং নিজস্ব ধারণা বিকাশ পায়। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে চলা শিশুর শেখা ও আবিষ্কারের প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে।

শিক্ষকরা অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে বাড়িতেও খেলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং শিশুর শেখার প্রক্রিয়ায় পিতামাতাকে সহায়তা করেন। এছাড়া শিক্ষক শিশুদের সামাজিকীকরণে সহায়তা করেন। দলগত খেলার আয়োজন যেমন ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্যান্য খেলার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা

সমাধান করার দক্ষতা তৈরি হয়। শিক্ষক শিশুদের আবেগ প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করেন। খেলার মাধ্যমে শিশুরা আনন্দ, রাগ বা হতাশা প্রকাশ করে এবং নতুন দক্ষতা অর্জন করে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। শিক্ষকের সহমর্মিতা ও দিকনির্দেশনা শিশুকে জয় ও পরাজয় দুটোই মেনে নিতে শেখায় এবং নেতিবাচক আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

এভাবে শিক্ষক শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সঠিক পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ, দিকনির্দেশনা এবং স্বাধীনতার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকের সহযোগিতা শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য এক শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলে।

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ একটি প্রক্রিয়া, যা তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করে। শিশুর শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিকাশের স্তরগুলো বোঝা শিক্ষক ও পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রারম্ভিক বয়সে শিশুর বিকাশকে সহায়তা করা তার ভবিষ্যৎ শিক্ষাগত ও সামাজিক সফলতার ভিত্তি স্থাপন করে। খেলাধুলা এই বিকাশকে উদ্দীপনা, সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে। তাই শিশু-কেন্দ্রিক নিরাপদ ও সহানুভূতিশীল পরিবেশ তৈরি করা প্রতিটি শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। একজন শিক্ষক হিসেবে লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুর এই বয়সভিত্তিক পরিবর্তনগুলো মাথায় রেখে একটি নিরাপদ, উদ্দীপক এবং সহানুভূতিশীল শিখন পরিবেশ তৈরি করা, যা প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্র বিকাশকে সমর্থন করবে।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী(রেফারেন্স)

১. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড)।

২. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড)।

৩. 'শিশুর বিকাশ ও খেলাভিত্তিক শিখন' বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সহায়িকা, (জানুয়ারি ২০২৩); ডিপিই, প্রাগম, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ।

৪. আকতার, ফ. (২০১৭). "শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলার ভূমিকা।" বাংলাদেশ শিক্ষা গবেষণা জার্নাল, খ- ২৩।

৫. *শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৬. শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়), ২০২০: প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা।

৭. *প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২,* জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৮. *প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২১ (পরিমার্জিত ২০২৫),* জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৯. প্রাক-প্রাথমিক (৫+) শিক্ষক সহায়িকা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

১০. Australian Children's Education and Care Quality Authority. (2018). *Developmental milestones and the EYLF/NQS*. https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2018-02/DevelopmentalMilestonesEYLFandNQS.pdf

১১. Bangladesh Open University. (n.d.). *Early childhood development (HSC Unit-05)*। Retrieved from http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2877/Unit-05.pdf

১২. Bredekamp, S. (2014). *Effective practices in early childhood education: Building a foundation* (2nd ed.). Pearson.

১৩. Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Developmental milestones: Birth to 5 years.* U.S. Department of Health and Human Services. https://www.cdc.gov/act-early/milestones/index.html
১৪. Ministry of Women and Children Affairs, Bangladesh Shishu Academy, & UNICEF Bangladesh. (2018). *Early learning and development standards (ELDS) for children from birth to 8 years.*
১৫. National Research Council. (2004). *Development during middle childhood: The years from six to twelve*. National Academies Press. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216770/
১৬. Parten, M. B. (1932). Social participation among preschool children. *Journal of Abnormal and Social Psychology, 27*(3), 243–269. https://doi.org/10.1037/h0074524
১৭. Santrock, J. W. (2019). *Child development* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
১৮. Stanford University School of Medicine. (2022). *Developmental milestones: Birth to 5 years (MedU Pediatrics Clerkship Document).*
১৯.https://med.stanford.edu/content/dam/sm/pediatricsclerkship/documents/5-Developmental-Milestones-MedU.pdf
২৩. American Psychiatric Association (APA). (2013). DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

অধ্যায় ২: শিশুর শিখন প্রক্রিয়া

শিশুর বিকাশ ও শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো তার শিখন প্রক্রিয়া। জন্মের পর থেকেই শিশু চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিখতে শুরু করে। দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, খেলা, অনুকরণ, প্রশ্ন করা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশুর জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ ও মনোভাব গড়ে ওঠে। শিখন কোনো একক বা নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি ধারাবাহিক, গতিশীল ও আজীবন চলমান প্রক্রিয়া। এই অধ্যায়ে শিশুর শিখনের প্রকৃতি, মৌলিক বৈশিষ্ট্য, ধাপসমূহ এবং শিখনকে প্রভাবিতকারী বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুর শিখনে শিক্ষকের ভূমিকা, খেলাভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিখনের গুরুত্ব এবং শিখন-প্রতিবন্ধকতা ও তার নিরসন কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। শিশুর ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য ও সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে কীভাবে একটি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আনন্দময় শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এই অধ্যায় তার দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

শিশুর শিখন প্রক্রিয়া

শিখন (Learning) হলো ধারাবাহিক, গতিশীল এবং অভিজ্ঞতানির্ভর একটি প্রক্রিয়া, যেখানে শিশু পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ, মূল্যবোধ ও মনোভাব অর্জন করে। জন্মের পরপরই শিখন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং শিশু তার ইন্দ্রিয়, অভিজ্ঞতা, খেলাধুলা, পর্যবেক্ষণ, অনুকরণ এবং ভাষার মাধ্যমে শিখতে থাকে। শিখন শুধু বিদ্যালয়েই ঘটে না বরং ঘর, খেলার মাঠ, দৈনন্দিন জীবন, পরিবার, সমবয়সী শিশু, সমাজ এমনকি সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়েও শিশুকে শেখায়।

শিশুর শিখনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক শিশুই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে শিখে। তাদের শিখনের ধরণ, পছন্দ, গতি, আগ্রহ, শক্তি এবং দুর্বলতা ভিন্ন। তাই শিশু এক ধরনের পদ্ধতিতে নয়, বরং একাধিক উপায়ে শেখে। শিশু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, অভিজ্ঞতা, সামাজিক যোগাযোগ, খেলা, ভাষা ও আবেগ ব্যবহার করে শেখে। শিশুর শিখনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

স্বভাবজাত কৌতূহল: শিশুরা স্বভাবগতভাবে অনুসন্ধানী। তারা স্পর্শ করে, চেখে দেখে, প্রশ্ন করে, ভেঙে পরীক্ষা করে এবং নতুন জিনিস আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। এই প্রাকৃতিক কৌতূহলই শেখার প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি।

অভিজ্ঞতানির্ভর: শিশু যা দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, খেলে তাই তার শিখনের ভিত্তি। শিশুর প্রতিটি অভিজ্ঞতা শিশুকে কিছু না কিছু শেখায়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিশু বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে শেখে। উদাহরণস্বরূপ, পানি নিয়ে খেলার মাধ্যমে শিশু ভাসা-ডোবার ধারণা শেখে।

ধারাবাহিকতা: শিশু শেখার প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। প্রথমে সহজ ধারণা শেখে, পরে ধীরে ধীরে জটিল ধারণা আয়ত্ত করে। যেমন: "১, ২, ৩" শেখার পর যোগ বা সংখ্যা মিলানোর ধারণা শেখে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া: বাবা-মা, শিক্ষক, ভাই-বোন এবং সহপাঠীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সামাজিক এবং ভাষাগত দক্ষতা দ্রুত বিকশিত হয়। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া শিশুর মানসিক ও আচরণগত বিকাশেও সাহায্য করে।

শিখনের পুনরাবৃত্তি: কোনো দক্ষতা বা আচরণ বারবার অনুশীলন করলে তা শিশুর স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়। পুনরাবৃত্তি শেখার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে।

সক্রিয় অংশগ্রহণ: শিশু সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখে । খেলতে খেলতে, প্রশ্ন করতে করতে, চেষ্টা করতে করতেই শিশু নতুন কিছু শিখতে পারে।।

স্বকীয়তা: প্রতিটি শিশু আলাদা, তাই তাদের শিখনগতি, আগ্রহ, সক্ষমতাও আলাদা। তাই শিক্ষাদানও শিশুর প্রয়োজন এবং আগ্রহ অনুযায়ী হতে হবে।

সৃজনশীলতা ও কল্পনা: শিশু কল্পনা ও সৃজনশীলভাবে চিন্তা করার মাধ্যমে নতুন ধারণা তৈরি করে। খেলাধুলা, গল্প বলা এবং শিল্পকর্মের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা বিকশিত হয়।

আবেগ ও মনোভাবের প্রভাব: শিশুর আবেগ, নিরাপত্তা ও উৎসাহ শেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শিশু সুখী, সুরক্ষিত এবং উৎসাহিত হলে আরও দ্রুত ও ফলপ্রসূভাবে শেখে।

প্রসঙ্গভিত্তিক শেখা: শিশু বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গে শেখার মাধ্যমে জ্ঞানকে আরও সহজে আয়ত্ত করতে পারে। এটি তার দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাকে উন্নত করে।

শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

শিশুর শিখন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা ধাপে ধাপে ঘটে। প্রতিটি ধাপ শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো হলো:

১। মনোযোগ আকর্ষণ

শিশু প্রথমে কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দেয়। যা হতে পারে ছবি, শব্দ, রং, গল্প, গান বা খেলা। মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া শেখা সম্ভব নয়। যেমন- শিশুকে যদি রঙিন বল বা বেলুন দেখানো হয়, সে তা ছুঁয়ে দেখে, ঘুরিয়ে দেখে এবং খেলার মাধ্যমে শেখার আগ্রহ প্রকাশ করে।

২। পর্যবেক্ষণ

শিশু আশপাশের মানুষ, বস্তু এবং পরিস্থিতি লক্ষ্য করে। নতুন কিছু দেখলে কৌতূহলী হয় এবং শেখার প্রক্রিয়ায় এটি সাহায্য করে। যেমন-শিশু দেখে অন্য বাচ্চারা কিভাবে পানির খেলায় ব্যস্ত; সে লক্ষ্য করে তারা পানি কিভাবে ঢালছে এবং ভেসে যাচ্ছে কিনা।

৩। প্রক্রিয়াকরণ

শিশু যে তথ্য পায়, তা তার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করে। সে মিল-অমিল করে, সম্পর্ক খুঁজে দেখার মাধ্যমে কোনো বিষয়, ঘটনা বা বস্তুর ধারণা তৈরি করে। সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। যেমন- শিশু প্রথমে দেখে কিভাবে পানি ঢেলে পাত্র ভরা যায়, পরে বস্তুর আকার ও ওজন দেখে বুঝতে চেষ্টা করে কোনটি দ্রুত ভরবে বা তীরে ভেসে যাবে।

৪। প্রয়োগ

শিশু শেখা বিষয় বাস্তবে ব্যবহার করে। এটি শুধু জ্ঞান আয়ত্ত নয়, আচরণ ও দক্ষতা অর্জনেরও অংশ। অন্যের আচরণ দেখে শিশু তা অনুকরণ করে। যেমন- গণিতের যোগফল শেখার পরে, শিশু দৈনন্দিন জীবনে ফল বা ফুলের সংখ্যা গণনা করে।

৫। পুনরাবৃত্তি ও মূল্যায়ন

শেখার প্রক্রিয়াকে স্থায়ী করতে অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য। শিশু একাধিকবার চেষ্টা, অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা বিষয় আয়ত্ত করে। যেমন- প্রতিদিন বাংলা অক্ষর বা সংখ্যা লেখা অনুশীলন করলে তা শিশুর স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়।

শিশুর শিখনকে প্রভাবিতকারী উপাদান

শিশুর শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা একাধিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই উপাদানগুলো শিশুর জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ এবং সামগ্রিক বিকাশকে শক্তিশালী বা দুর্বল করতে পারে। প্রধান উপাদানগুলো হলো:

১। জৈবিক উপাদান (Biological Factors)

শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য তার শেখার ক্ষমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুস্থ শরীর, পর্যাপ্ত ঘুম, সঠিক পুষ্টি এবং মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ শিশুকে আরও মনোযোগী, চটপটে ও কার্যকরভাবে শেখার যোগ্য করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ:

সঠিকভাবে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং পর্যাপ্ত ঘুম নেওয়া শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখতে এবং নতুন জ্ঞান শিখতে সাহায্য করে।

২। পরিবেশগত উপাদান (Environmental Factors)

শিশু যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে তা তার শিখনের গুণমানকে প্রভাবিত করে। সুস্থ ও সুরক্ষিত ঘর, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, খোলামেলা পরিবেশ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ শিশুর শেখার আগ্রহ বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ: পরিষ্কার ও আলোযুক্ত ক্লাসরুম, খেলাধুলার জন্য খোলা মাঠ, বইপত্র এবং খেলনার সহজলভ্যতা শিশুকে আরও সক্রিয়ভাবে শেখায়।

৩। সামাজিক উপাদান (Social Factors)

শিশুর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক তার শেখার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভালো পারিবারিক সম্পর্ক, শিক্ষকের উৎসাহ, সহপাঠীদের সঙ্গে সুস্থ যোগাযোগ শিশুর আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক দক্ষতা বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ: বাবা-মায়ের সঙ্গে গল্প করা বা বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা শিশুদের ভাষা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা উন্নত করে।

৪। অর্থনৈতিক উপাদান (Economic Factors)

শিশুর শিক্ষা ও শেখার সুযোগ তার পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত। পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ, পুষ্টিকর খাবার, স্কুলে যাওয়ার সুযোগ এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সেবা শিশুর শেখার সক্ষমতা বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ: স্কুলে বই, কাগজ, পেন্সিল, খেলনা বা ল্যাব সরঞ্জামের সহজলভ্যতা শিশুকে কার্যকরভাবে শেখার সুযোগ দেয়।

শিশুর শিখনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষক শিশুর শেখার প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। একজন শিক্ষক শুধু জ্ঞান প্রদানকারী নন, তিনি শিশুদের কৌতূহল উদ্দীপিতকারী, উৎসাহদাতা এবং পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষক শিশুর শেখার পথপ্রদর্শক। যদি শিক্ষক শিশুর আগ্রহ, ক্ষমতা, আবেগ, শিখনশৈলী এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে পাঠদান করেন, তবে শেখা হবে আনন্দময়, কার্যকর এবং টেকসই। শিশুর শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে শিক্ষকের করণীয় হলো:

শিখনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি

শিশু যাতে নিরাপদ এবং আনন্দময়ভাবে শিখতে পারে, সেই জন্য শ্রেণিকক্ষে রঙিন ও আকর্ষণীয় উপকরণ, খেলার সুযোগ, আলাদা জায়গা, দলীয় কাজের আয়োজন এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ নিশ্চিত করতে হয়।

শিশুর আগ্রহ অনুযায়ী শেখানো

প্রতিটি শিশুর আগ্রহ, সক্ষমতা এবং শিখনশৈলী ভিন্ন। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিশুদের আগ্রহের সঙ্গে পাঠকে সংযুক্ত করা। উদাহরণস্বরূপ, যে শিশু আঁকতে ভালোবাসে, তাকে আঁকার মাধ্যমে গণিত বা বিজ্ঞান শেখানো যায়।

সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

শিশু শুধু শুনে শেখে না; করতে করতে শেখা অধিক ফলপ্রসূ। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিশুকে খেলাধুলা, হাতে কলমের কার্যক্রম, ছোট ছোট পরীক্ষা বা প্র্যাকটিক্যালের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে শেখানোর সুযোগ দেওয়া।

মূল্যায়নকে শেখার সহায়ক করা

শিশুর অগ্রগতি কেবল পরীক্ষার মাধ্যমে নয়, বরং পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ, দলীয় কাজ, খাতার কাজ এবং খেলাধুলার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা উচিত। এটি শিশুকে শেখার জন্য আরও উৎসাহিত করে।

শিশুর মানসিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য বোঝা

শিশুর আবেগ, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা শেখার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। শিক্ষককে ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল এবং পরামর্শদাতা হিসেবে থাকতে হয়, যাতে শিশু ভয় বা দ্বিধা ছাড়াই নতুন কিছু শিখতে পারে।

শিশুর শিখনে খেলার ভূমিকা

খেলাধুলা শিশুর স্বভাব এবং শেখার একটি প্রধান মাধ্যম। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু শিক্ষা, সামাজিক দক্ষতা এবং সৃজনশীলতা বিকাশ করে। প্রাথমিক শিক্ষায় খেলাভিত্তিক শিখনের গুরুত্ব নিচের পয়েন্টগুলোতে বর্ণনা করা যায়:

সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি

খেলার মাধ্যমে শিশু বিভিন্ন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং নিজে সমাধানের চেষ্টা করে। এটি তাদের চিন্তাশক্তি ও লজিকাল দক্ষতা উন্নত করে। যেমন- লুকোচুরি খেলার সময় শিশুকে পথ খুঁজে বের করতে হয় বা দলবদ্ধভাবে কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।

সামাজিক নিয়ম ও দলের সঙ্গে কাজ শেখা

খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু শিখে কীভাবে দলের সঙ্গে কাজ করতে হয়, নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং বন্ধুদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়। যেমন-ফুটবল বা অন্য দলভিত্তিক খেলায় শিশুরা অংশ নিতে, খেলা ভাগাভাগি করতে এবং পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে শেখে।

ভাষা, গণনা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি

খেলার সময় শিশু নতুন শব্দ, সংখ্যা, রঙ এবং ধারণা শেখে। একই সঙ্গে তাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনাও বিকশিত হয়। যেমন- লুডু, পাজল বা রঙের ব্লক দিয়ে খেলতে খেলতে শিশুরা সংখ্যা গুনা, রঙ চেনা এবং সমস্যা সমাধান শেখে।

শিশুর শিখনে প্রযুক্তির ভূমিকা

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযুক্তি সীমিতভাবে ব্যবহার করা গেলে শিখন আরও আকর্ষণীয়, ইন্টারঅ্যাকটিভ এবং কার্যকর হয়ে ওঠে। শিশুর শেখার মধ্যে ভিডিও, অ্যানিমেশন, শিক্ষামূলক গেম এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে প্রযুক্তি ব্যবহারে কিছু বিষয় সতর্কভাবে মানা জরুরি। কারণ, অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইম শিশুর দৃষ্টি ও মনোযোগ কমাতে পারে। প্রযুক্তি যদি একমাত্র শেখার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, তবে শিশুর সৃজনশীলতা ও সক্রিয় খেলার সুযোগ সীমিত হতে পারে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও হাতে-কলমের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কমে যেতে পারে। তাই বলা যায়, প্রযুক্তি শিশুর শেখার প্রক্রিয়াকে আকর্ষণীয় ও সহজ করে তুলতে পারে, কিন্তু সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতার সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

শিশুর শিখন-প্রতিবন্ধকতা

শিখন-প্রতিবন্ধকতা হলো এমন এক অবস্থা যেখানে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও বুদ্ধিমত্তা থাকা সত্ত্বেও পড়া, লেখা, গণিত, মনোযোগ বা ভাষা ব্যবহারসংক্রান্ত দক্ষতায় ধারাবাহিকভাবে পিছিয়ে থাকে। এধরণের শিশুর মস্তিষ্কের তথ্য–প্রক্রিয়াকরণে বিশেষ ধরনের অসুবিধা থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিখন-প্রতিবন্ধকতাকে একটি স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে যেখানে এক বা একাধিক বিষয়ে শেখার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়।

শিশুর শিখন-প্রতিবন্ধকতার সাধারণ ধরন

১. ডিসলেক্সিয়া (পড়তে সমস্যা)

- শিশুরা অক্ষর চিনতে সমস্যা অনুভব করে।
- শব্দ পড়তে তাদের সময় বেশি লাগে।
- একই শব্দ বারবার ভুলভাবে পড়ে।

- পড়া বুঝতেও অসুবিধা হয়।

২. ডিসগ্রাফিয়া (লিখতে সমস্যা)

- শিশুর লেখা এলোমেলো হয় এবং পরিষ্কার থাকে না।
- অক্ষরের আকার ঠিক রাখতে পারে না।
- বানান ভুল বেশি হয়।
- কখনও কখনও অক্ষর উল্টো লেখা হয়।

৩. ডিসক্যালকুলিয়া (গণিত শেখার সমস্যা)

- সংখ্যা চেনায় অসুবিধা
- যোগ, বিয়োগের ধারণা বুঝতে সমস্যা
- সময়, মাপ, পরিমাপ বুঝতে অসুবিধা
- বয়স উপযোগী সাধারণ গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে না পারা

৪. অতি চঞ্চলতা ও অমনোযোগিতা

- শিশু অতি চঞ্চল হয়।
- কোনো কাজ বা কার্যক্রমে দীর্ঘ সময় মনোযোগ রাখতে পারে না।
- নির্দেশনা শুনেও তা ঠিকমত পালন করতে দেরি হয়।

৫. ভাষা শিখতে সমস্যা

- শিশুর বয়স অনুযায়ী কথা বলার ক্ষমতা কম থাকে।
- শব্দের ব্যবহার সীমিত থাকে।
- বাক্য গঠন করতে সমস্যা হয়।
- নির্দেশ বা কথার অর্থ বুঝতেও অসুবিধা হয়।

শিশুর শিখন-প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করতে করণীয়

১. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ

শিক্ষককে প্রতিদিনের কাজ, শ্রেণিকক্ষের আচরণ, কার্যপত্র এবং মৌখিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শিশুকে লক্ষ্য করতে হবে।

২. শিশুর সমস্যার বিষয়গুলোকে লিখে রাখা

শিশুর অগ্রগতি বা সমস্যা নিয়মিতভাবে লিখে রাখা যেমন- কোন ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, কী ধরনের ভুল বারবার হচ্ছে, কোন পরিস্থিতিতে সমস্যাটি বাড়ে ইত্যাদি।

৩. প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের কাছে প্রেরণ করা

যদি সমস্যার গভীরতা বেশি হয়, তবে শিশুকে বিশেষজ্ঞ শিশু মনোচিকিৎসক /মনোবিজ্ঞানী / থেরাপিস্ট / স্পিচ থেরাপিস্ট-এর কাছে পাঠানো উচিত।

৪. শিক্ষকবৃন্দের উদ্যোগ

সময়মতো প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করা হলে শিশুর শিক্ষাজীবন অনেক সহজ হয়। তাই বেশকিছু বিষয়ের দিকে শিক্ষকের মনোযোগ দেয়া উচিৎ:

আচরণগত লক্ষণ

- বারবার একই বিষয় ভুলে যাওয়া
- কাজ শুরু করতে দেরি করা
- নির্দেশ বুঝতে না পারা
- সহপাঠীদের তুলনায় কাজ শেষ করতে বেশি সময় নেওয়া
- পড়ার সময় অক্ষর বাদ দেওয়া বা যোগ করা
- অক্ষর উল্টো করে লিখা
- প্রায়শই বয়স উপযোগী সাধারণ গাণিতিক সমস্যার (সাধারণ যোগ বিয়োগ) সমাধান করতে না পারা

সামাজিক-মানসিক লক্ষণ

- আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া
- দলগত কাজে অনীহা
- ব্যর্থতার ভয়ে বাড়ির বা শ্রেণীর কাজ করতে না চাওয়া
- পুনরাবৃত্তির পরও শেখায় উন্নতি না হওয়া

পরিবার থেকে পাওয়া তথ্য

- বাড়িতে পড়ালেখায় মন না দেয়া
- ভাষা শিখতে ও ভাষার ব্যবহার করতে অসুবিধা
- বাড়িতে সাধারণ নির্দেশ পালনে দেরী/অসুবিধা

শিশুর এসকল শিখন-প্রতিবন্ধকতা যদি শুরুর সময়মতো সনাক্ত করা যায়, তবে শিশুর শেখার প্রক্রিয়া অনেক সহজ ও কার্যকর করা সম্ভব। এতে শিশুর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যায়, শেখার ঘাটতি কমানো সম্ভব হয় এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে সহজ ও সমৃদ্ধ করা যায়। এছাড়া, পিতা-মাতা ও শিক্ষকের সহযোগিতা আরও কার্যকর হয় এবং শিশুর সামাজিক দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

শিশুর শিখন-প্রতিবন্ধকতা নিরসনে শিক্ষকের করণীয়

শিখন-প্রতিবন্ধকতা থাকা মানে এই নয় যে শিশুটি শিখতে সক্ষম নয়; বরং তারা অন্য শিশুদের তুলনায় ভিন্ন কৌশলে, ধীরগতিতে বা অতিরিক্ত সহায়তায় শিখে। তাই সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে শিখন-প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

১. সহায়ক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি

শিক্ষার প্রথম শর্ত হলো একটি নিরাপদ ও উৎসাহদায়ক পরিবেশ তৈরি। অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ শিশুদের শেখার গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়। সেকারনে শিক্ষকের উচিত-

- শ্রেণিকক্ষে আনন্দের মাধ্যমে শেখানোর চর্চা কর্রানো
- ভয়ের বদলে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো
- কাজের চাপ কমিয়ে ছোট ধাপে শেখানো

এর মাধ্যমে শিখন-প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন শিশুদের শেখায় আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

২. ভিন্নপদ্ধতিতে শিক্ষাদান

শ্রেণিকক্ষে সব শিশুর একই ধরনের শেখার ক্ষমতা থাকে না। তাই শিক্ষককে বিভিন্ন কৌশলে একই বিষয় শেখাতে হবে। যেমন:

- ডিসলেক্সিয়া থাকা শিশুর জন্য বড় অক্ষর, রঙিন শব্দ কার্ড ব্যবহার
- ডিসগ্রাফিয়া থাকা শিশুর জন্য মোটা পেন্সিল, লাইনযুক্ত কাগজ ব্যবহার
- ডিসক্যালকুলিয়া থাকা শিশুর জন্য বাস্তব বস্তু (ছোট বল, বোতাম, কাঠি ইত্যাদি) ব্যবহার

শিশু যখন হাতেকলমে কাজ করার মাধ্যমে শেখে, তখন তাদের শেখার বৈচিত্র্য পূরণ হয়।

৩. ধাপে ধাপে শেখানো

শিশুর সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষককে শেখানোর ধাপগুলো সাজাতে হবে। যেমন:

- বড় কাজকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করা
- ধীরে ধীরে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া
- প্রথমে দেখিয়ে শেখানো, পরে শিশুকে নিজে করতে দেওয়া

এই কৌশল শিশুদের শেখার চাপ কমায় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

৪. পুনরাবৃত্তি ও চর্চার সুযোগ

শিখন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন শিশুদের অন্যদের তুলনায় বেশি অনুশীলন করা প্রয়োজন। তাই শিক্ষকের উচিত-

- প্রতিদিন ৫-১০ মিনিট করে ছোট অনুশীলন করানো
- ছবি দেখে শব্দ বলানো
- গণনা অনুশীলন করানো

পুনরাবৃত্তি শিশুদের স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং শেখাকে স্থায়ী করে।

৫. প্রযুক্তি ব্যবহার

সীমিত ও কার্যকরীভাবে ভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন শিশুর জন্য বিশেষ সহায়ক হতে পারে। তাই শিক্ষকের উচিত-

- অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ ব্যবহার করা
- শিক্ষামূলক ভিডিও প্রদর্শন
- উচ্চারণ, পাঠ এবং গণনা সম্পর্কিত ভিডিও প্রদর্শন

৬. ইতিবাচক উৎসাহ ও পুরস্কার

শিখন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন শিশুদের মানসিকভাবে শক্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ছোট অগ্রগতিকেও প্রশংসা, হাসি, হাততালি বা মৌখিকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। শিক্ষক এক্ষেত্রে নিচের প্রশংসাসূচক বাক্যগুলোর মত করে এমন আরও উদ্যোগ নিতে পারেন-

- “তুমি পারবে”
- “আজ তুমি গতকালের চেয়ে ভালো করেছ”

এসব কথায় শিশু শেখার প্রতি আগ্রহী হয়।

৭. পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

শিশুর সমস্যা ও তা সমাধানের সঠিক উৎস পরিবার -বিদ্যালয়-শিক্ষকের যৌথ আলোচনায় এ বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়। শিক্ষক্মজানার চেষ্টা করবেন-

- ঘরে শিশুর আচরণ কেমন

- নিয়মিত পড়ার অভ্যাস আছে কি না
- এসব তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষক কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

৮. খেলাভিত্তিক শিখন

প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা খেলতে খেলতেই সবচেয়ে ভালো শেখে। শিক্ষক এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপকরণ ও খেলার যথাযথ ব্যবহার ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবেন। যেমন-

- শব্দ গেম
- পাজল
- গণনা-কার্ড
- রোল-প্লে

এসকল কার্যক্রম শিখন-প্রতিবন্ধী শিশুদের মনোযোগ ও ভাষা বিকাশে বড় ভূমিকা রাখে।

শিশুর শিখন একটি ধারাবাহিক ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া, যেখানে শিশুর মস্তিষ্কের দ্রুত বিকাশের সময় সঠিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, অনুকরণ, গল্প-গল্প শোনা এসবই শিশুর শেখার প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় পরিবার ও শিক্ষক শিশুর শিখনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে যদি দীর্ঘ সময় ধরে শিশুর অগ্রগতি লক্ষ্য করা না যায়, তবে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেওয়া উচিৎ। এর মধ্যে শিশুর মানসিক ও শিক্ষাগত সমস্যা নির্ণয়ের জন্য মনোচিকিৎসক, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী, স্পিচ থেরাপিস্ট এবং অকুপেশনাল থেরাপিস্ট সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে সহায়তা গ্রহণ করলে শিশুর শেখার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয় এবং তার সামগ্রিক বিকাশে সহায়ক হয়।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বলতে শিশুর আবেগগত সুস্থতা, চিন্তাভাবনার ভারসাম্য, নিজেকে ও অন্যকে বোঝার সক্ষমতা এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষমতাকে বোঝায়। এটি শিশুর অনুভূতি প্রকাশ, আচরণ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সম্পর্ক গঠন এবং শেখার আগ্রহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মানসিক স্বাস্থ্যকে সংজ্ঞায়িত করেছে এমন একটি অবস্থা হিসেবে, যেখানে ব্যক্তি নিজের সক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে, জীবনের স্বাভাবিক চাপ মোকাবিলা করতে পারে, উৎপাদনশীলভাবে কাজ করতে পারে এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এই সংজ্ঞা শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তবে তাদের বয়স ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হয়। UNICEF এর মতে, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য মানে কেবল মানসিক রোগের অনুপস্থিতি নয়; বরং এটি শিশুর সামগ্রিক সুস্থতা, নিরাপত্তাবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক সামাজিক ও আবেগগত বিকাশকে অন্তর্ভুক্ত করে। সর্বোপরি বলা যায়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য একটি গতিশীল ও বিকাশমান প্রক্রিয়া, যা শিশুর শিখন, আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

শিশুর শিখনের সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক

শিশুর শিখন প্রক্রিয়া মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানসিকভাবে সুস্থ শিশু শেখার পরিবেশে বেশি মনোযোগী থাকে, নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণে আগ্রহ দেখায় এবং শেখার কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। শিশুর আবেগগত স্থিতিশীলতা তার মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসের ওপর সরাসরি প্রভাব

ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু যখন নিরাপদ, ভালোবাসাময় ও সহায়ক পরিবেশে থাকে, তখন তার মস্তিষ্কের বিকাশ ইতিবাচকভাবে ঘটে এবং শিখন প্রক্রিয়া সহজ হয়। বিপরীতে, উদ্বেগ, ভয়, অতিরিক্ত চাপ বা নিরাপত্তাহীনতা শিশুর শেখার আগ্রহ কমিয়ে দেয় এবং শিখনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, মানসিক স্বাস্থ্য শিশুকে দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং নিজের সক্ষমতা কাজে লাগাতে সহায়তা করে। এই সক্ষমতাগুলো শিশুর শেখার ধারাবাহিকতা ও শিখন সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, প্রারম্ভিক শৈশবে মানসিক সমস্যার যথাযথ সমাধান না হলে তা শিশুর শিখন আচরণে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন মনোযোগের ঘাটতি, শেখার প্রতি অনীহা, আচরণগত সমস্যা কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাব ইত্যাদি। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও শিখন একে অপরের পরিপূরক। মানসিকভাবে সুস্থ শিশু শেখার ক্ষেত্রে বেশি সক্ষম হয় এবং তার সামগ্রিক বিকাশ ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যায়।

প্রারম্ভিক শৈশবে মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের গুরুত্ব

১. প্রারম্ভিক শৈশবকাল (জন্ম থেকে প্রায় ৮ বছর) শিশুর মস্তিষ্ক ও মানসিক বিকাশের সবচেয়ে সংবেদনশীল সময়। এই সময়ে শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক আচরণের ভিত্তি গড়ে ওঠে। প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও সম্পর্ক শিশুর মানসিক সুস্থতায় গভীর প্রভাব ফেলে।

২. এই বয়সে শিশুর নিরাপদ ও যত্নশীল পরিবেশ তার আবেগ প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা বাড়ায়। ফলে শিশু ধীরে ধীরে নিজের অনুভূতি বুঝতে শেখে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

৩. প্রারম্ভিক শৈশবে পরিবার ও আশপাশের মানুষের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক শিশুর মানসিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যত্নশীল সম্পর্ক শিশুর সামাজিক দক্ষতা ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. এই সময়ে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকলে শিশু শেখার প্রতি আগ্রহী হয় এবং আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। অন্যদিকে, অবহেলা বা অতিরিক্ত চাপ শিশুর শিখন আচরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রারম্ভিক শৈশবে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতে মানসিক সমস্যা কমাতে এবং শিশুর সুস্থ জীবনযাপনের ভিত্তি তৈরি করতে সহায়ক।

৬. প্রারম্ভিক বয়সে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হলে শিশু ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল, সহানুভূতিশীল ও সামাজিকভাবে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

মানসিক সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণ

১. আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন

শিশুর স্বাভাবিক আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন দেখা দিলে তা মানসিক সমস্যার একটি প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। যেমন-আগে সক্রিয় শিশুর অতিরিক্ত চুপচাপ হয়ে যাওয়া বা হঠাৎ আক্রমণাত্মক আচরণ করা।

২. অতিরিক্ত ভয়, দুঃখ বা উদ্বেগ

শিশু যদি অকারণে বারবার ভয় পায়, দীর্ঘসময় দুঃখী থাকে বা অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, তবে তা মানসিক চাপ বা সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।

৩. **শেখার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া**
মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত শিশু শেখার কার্যক্রমে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না এবং পাঠে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। এটি শিশুর শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

৪. **সামাজিক যোগাযোগে অনীহা**
শিশু যদি সহপাঠী বা পরিবারের সদস্যদের সাথে মিশতে না চায়, একা থাকতে পছন্দ করে বা সামাজিক কার্যক্রম এড়িয়ে চলে, তবে তা মানসিক সমস্যার লক্ষণ হতে পারে।

৫. **আবেগ নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা**
অতিরিক্ত রাগ, কান্না বা হতাশা শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতার প্রকাশ হতে পারে, যা মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে।

৬. **ঘুম ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন**
ঘুমের সমস্যা, দুঃস্বপ্ন দেখা, ক্ষুধামন্দা বা অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতাও শিশুর মানসিক সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭. **আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি**
শিশু নিজেকে অযোগ্য মনে করা, নতুন কাজে অংশ নিতে ভয় পাওয়া বা সহজেই হতাশ হয়ে পড়া মানসিক চাপের প্রকাশ হতে পারে।

শিশুর মানসিক চাপের কারণ

১. **পরিবারিক অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা**
পরিবারে কলহ, বিচ্ছেদ, অবহেলা বা অতিরিক্ত শাসন শিশুর মনে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি করে, যা মানসিক চাপের অন্যতম কারণ।

২. **ভালোবাসা ও যত্নের অভাব**
শিশু পর্যাপ্ত স্নেহ, সময় ও ইতিবাচক মনোযোগ না পেলে নিজেকে অবমূল্যায়িত মনে করে। এর ফলে শিশুর মানসিক স্থিতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

৩. **অতিরিক্ত একাডেমিক চাপ**
বয়সের তুলনায় বেশি পড়াশোনার চাপ, ফলাফলভিত্তিক প্রত্যাশা ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ শিশুর মধ্যে উদ্বেগ ও ভয় সৃষ্টি করতে পারে।

৪. **শাস্তিমূলক ও নেতিবাচক আচরণ**
বারবার বকাঝকা, শারীরিক বা মানসিক শাস্তি শিশুর আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় এবং মানসিক চাপ বাড়ায়।

৫. **সামাজিক সম্পর্কের সমস্যা**
সহপাঠীদের সাথে দ্বন্দ্ব, বন্ধুত্বের অভাব, উপহাস বা বুলিং শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬. **পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তা**
বিদ্যালয় পরিবর্তন, বাসস্থান বদল, প্রিয়জনের মৃত্যু বা দীর্ঘসময় পরিবারের বাইরে থাকা শিশুর মনে মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে।

৭. **ট্রমা ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা**
দুর্ঘটনা, সহিংসতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যে কোনো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শিশুর মনে গভীর মানসিক চাপ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে।

পরিবারের করণীয়

১. নিরাপদ ও স্নেহময় পরিবেশ নিশ্চিত করা
পরিবারের মধ্যে শিশুর জন্য একটি নিরাপদ, স্নেহময় ও সমর্থনমূলক পরিবেশ থাকা অত্যন্ত জরুরি। শিশুর মনোজগতে নিরাপত্তাবোধ থাকলে সে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয় এবং মানসিকভাবে স্থিতিশীল থাকে। নিরাপদ পরিবেশ মানে শুধু শারীরিক সুরক্ষা নয়; এটি আবেগগত সমর্থন, প্রিয়জনের মনোযোগ এবং শিশুর সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে।

২. ইতিবাচক আচরণ ও প্রশংসা
শিশুর ছোট ছোট সাফল্য ও প্রচেষ্টা চিনে নেওয়া এবং প্রশংসা করা তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। পরিবারে শিশুর ইতিবাচক আচরণকে স্বীকৃতি দিলে সে শেখার প্রতি আরও আগ্রহী হয় এবং নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণে উৎসাহী থাকে।

৩. খোলা যোগাযোগ ও সংলাপ
শিশুর অনুভূতি, ভয়, সমস্যা বা দুঃখের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি। পরিবারকে শিশুর সঙ্গে নিয়মিত আলাপ ও যোগাযোগ রাখতে হবে এবং শিশুর বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। এটি মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে এবং শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৪. নিয়মিত দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখা
শিশুর ঘুম, খাওয়া, খেলাধুলা এবং শেখার সময়ের একটি সুসংগঠিত রুটিন থাকা মানসিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিত করে। একটি স্থিতিশীল রুটিন শিশুকে সময়ের মূল্য বোঝাতে সাহায্য করে এবং উদ্বেগ কমায়।

৫. সমস্যা সমাধান ও সহায়ক আচরণ শিক্ষা দেওয়া
শিশুকে ইতিবাচকভাবে সমস্যা সমাধানের কৌশল শেখানো, মানসিক চাপ মোকাবিলার সহজ উপায় দেখানো এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল শিখানো উচিত। এটি শিশুর আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। পরিবারকে শিশুকে উদাহরণ দেখিয়ে শেখানোর চেষ্টা করা উচিত।

৬. পরিবারের সমন্বয় ও একতা
শিশু তার অভিভাবকের মধ্যে বিরোধ, কলহ বা অমিল দেখতে পেলে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। তাই অভিভাবকদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক ও সমন্বয় শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে ইতিবাচক সম্পর্কের মডেল শিশুকে সামাজিক দক্ষতা ও সংবেদনশীলতা শেখায়।

৭. **পেশাদার সহায়তার সচেতনতা**

যদি শিশু দীর্ঘসময় উদ্বেগ, ভয়, আচরণগত সমস্যা বা আবেগ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা প্রদর্শন করে, তাহলে অভিভাবকের উচিত সময়মতো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা কাউন্সেলরের সঙ্গে যোগাযোগ করা। প্রাথমিক পর্যায়ে সহায়তা শিশুর মানসিক সমস্যার গভীরতা কমাতে সাহায্য করে।

বিদ্যালয়ের করণীয়

১. সহায়ক ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা

শ্রেণিকক্ষে শিশুর জন্য একটি নিরাপদ, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সমর্থনমূলক পরিবেশ তৈরি করা উচিত। শিশুরা যদি নিজেকে সুরক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য মনে করে, তবে তারা নিজের মতামত প্রকাশ করতে ও নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণে সাহসী হয়। এটি মানসিক স্থিতিশীলতা ও শেখার আগ্রহ বাড়ায়.

২. ইতিবাচক শিক্ষণ ও প্রশংসা

শিক্ষকরা শিশুর প্রচেষ্টা, অর্জন এবং ইতিবাচক আচরণকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রশংসা করলে শিশুর আত্মবিশ্বাস ও শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এমন প্রশংসা শিশুকে ভুল থেকে শেখার জন্যও উৎসাহ দেয়।

৩. মানসিক চাপ কমানোর কৌশল শেখানো

শিক্ষকরা সহজ কৌশল যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, সমস্যা সমাধানের উপায়, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং আবেগ প্রকাশের সঠিক উপায় শিশুকে শেখাতে পারেন। এগুলো শিশুর মানসিক চাপ মোকাবিলায় সহায়ক হয়।

৪. সহপাঠী সম্পর্ক ও সামাজিক দক্ষতা গঠন

শ্রেণিকক্ষে শিশুকে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব এবং সামাজিক দক্ষতা শেখানো উচিত। শিক্ষকরা সহপাঠীদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলা, দলগত কাজ ও সমন্বিত কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৫. শ্রেণিকক্ষে স্থিতিশীল রুটিন বজায় রাখা

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও শেখার ধারাবাহিকতার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত রুটিন বজায় রাখা জরুরি। এটি শিশুদের নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস ও সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

৬. সমস্যা শনাক্তকরণ ও সহায়তা প্রদান

শিক্ষকরা শিশুর মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা আচরণগত সমস্যা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজন হলে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। গুরুতর ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা কাউন্সেলরের সাহায্য নেওয়া উচিত।

৭. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি

বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। যাতে তারা শিশুর মানসিক সমস্যা সনাক্ত করতে পারে, সহায়ক পরিবেশ বজায় রাখতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী(রেফারেন্স)

1. APA (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).*
2. Lyon, G.R. (1996). *Learning Disabilities Research & Practice.*
3. National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD) Guidelines NJCLD https://njcld.org/
4. Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children.*
5. Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior.*
6. Snowling, M. (2013). *Dyslexia: A Very Short Introduction.*
7. Tomlinson, C. (2001). *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms.*
8. UNESCO (2017). *Early Childhood Care and Education Guidelines.*
9. UNICEF (2014). *Teaching Children with Disabilities in Inclusive Settings.*
10. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.*
11. WHO (2011). *World Report on Disability.*
12. World Health Organization (WHO). (2020). *Guidelines on mental health promotive and preventive interventions for children and adolescents.*
13. UNICEF. (2019). *Mental health of children and young people.*
14. *Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (2000). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. National Academy Press.*
15. *American Psychiatric Association (APA). (2013). DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.*

অধ্যায় ৩: শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

মনোবিজ্ঞানে শিখন বলতে বোঝায় এমন জ্ঞান, দক্ষতা বা আচরণ, যা জীবের জন্মগত নয় বরং পরিবেশের উদ্দীপকের প্রভাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষ হোক বা প্রাণি, তারা প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে জানাতে ধীরে ধীরে শিখে নেয় কোন আচরণ করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়। তাই শিখন হলো পরিবেশের সাথে ক্রমাগত খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটি অর্জিত প্রক্রিয়া, যা আচরণ পরিবর্তন, জ্ঞান সঞ্চয়, বিশ্লেষণক্ষমতা, দক্ষতার ব্যবহার সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী শিখনকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করলেও মূলত শিখন হচ্ছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আচরণ বা জ্ঞানের স্থায়ী পরিবর্তন।

মানুষের আচরণ ও মানসিক বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হলো শিখন। জন্মের পর থেকেই মানুষ পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন আচরণ, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। শিশু খেলনা ধরতে হাত বাড়ায় বা পশু খাদ্যের জন্য উপায় খুঁজে নেয় - এসবই সরাসরি শেখানো নয়, বরং অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত শিখন। তাই শিখনকে সাধারণভাবে বলা যায় অভিজ্ঞতার ফলে আচরণে বা মানসিক গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন। শিক্ষামনোবিজ্ঞানীরা শিখনের এই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে বহু তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। কেউ শিখনকে জ্ঞান সঞ্চয়, কেউ দক্ষতা অর্জন, আবার কেউ সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। বাস্তবে শিখন একটি জটিল মানসিক কার্যক্রম, যা সচেতনভাবে (ইচ্ছাকৃত) বা অচেতনভাবে (অনিচ্ছাকৃত) ঘটতে পারে। শিখনকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন উপাদান: শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষমতা, শারীরবৃত্তীয় অবস্থা, মানসিক প্রস্তুতি, আবেগ, সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ইত্যাদি। শিখনকে বোঝার সুবিধার্থে মনোবিজ্ঞানীরা এর নানা শ্রেণি নির্ধারণ করেছেন: পেশীজ শিখন, ভাষাগত শিখন, ধারণা শিখন, সমস্যা সমাধান শিখন, মূল্যবোধ ও মনোভাবভিত্তিক শিখন ইত্যাদি। একইভাবে শিখনের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে বিভিন্ন তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, যেগুলো চারটি প্রধান দৃষ্টিকোণে বিন্যস্ত করা যায়: আচরণবাদী, জ্ঞানবাদী, মানবতাবাদী, এবং সামাজিক বা সমাজবাদী। প্রত্যেক প্রেক্ষিতেই একাধিক মনোবিজ্ঞানী শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা আধুনিক শিক্ষায় পাঠদান, মূল্যায়ন, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অধ্যায়ে এসব তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

জ্যাঁ পিঁয়াজে (J. Piaget) এর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ তত্ত্ব

একটি শিশু ঝুমঝুমি বাজাতে বাজাতে ঝুমঝুমি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে। এখানে শিশু মূলত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। শিশুর এই জানার পেছনে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাথে মানসিক ক্রিয়াকলাপের একটি সম্পর্ক রয়েছে। বিখ্যাত সুইস চিন্তাবিদ, মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ জ্যাঁ পিঁয়াজে বলেছেন, শিক্ষার্থীকে নতুন কিছু শেখানোর জন্যে তাকে নতুন তথ্য দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি ও পরিপক্কতারও দরকার আছে। জ্যাঁ পিঁয়াজের বিকাশ সংক্রান্ত এই মতবাদ আধুনিক মনোবিদ্যার ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি তত্ত্ব, যা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ তত্ত্ব (Cognitive Development Theory) নামে পরিচিত। তাঁর এই তত্ত্বের মূল কথা হল, ‘সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিশুর জ্ঞান সংগঠিত ও বিকশিত হয়, এটা মানুষের জন্মগত বা বংশগত কোন অর্জন নয়’।

পিঁয়াজে মনে করেন, মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা করে, মানুষের এই চিন্তার মানসিক প্রক্রিয়াকেই পিঁয়াজে তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের তত্ত্বে বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে তিনি একটি শিশু তার জগতকে কীভাবে দেখে, কীভাবে চিন্তা করে এবং বুঝতে শেখে তা অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। ধরা যাক, একজন শিশু শহরে বাস করে। সে কুকুর দেখেছে, কিন্তু কখনো ছাগল দেখেনি। কুকুরের চার পা, মাথা, লেজ প্রভৃতি নিয়ে কুকুর সম্পর্কে তার একটি ধারণা গঠিত হয়েছে। একদিন গ্রামে গিয়ে একটি বড় ছাগল দেখে সে 'কুকুর' বলে উঠলো। তার বাবা তাকে শুধরে দিয়ে বললেন, এটা কুকুর নয়, এটা ছাগল। এরপর তারা পথে আরো কয়েকটি ছাগল দেখলো এবং ছাগলের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত শিশুটি ছাগলকে আর কুকুর বলল না। 'ছাগল'কে সে 'ছাগল'ই বলল। এই যে ঘটনাটি, এটি সাধারণভাবে দেখলে সহজ একটি বিষয় মনে হয়। কিন্তু এখানে শিশুর শেখার যে প্রক্রিয়া সেটি সহজ কিছু নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথমত সে যখন নতুন একটি প্রাণী দেখলো তখন, সে তার পরিচিত একটি প্রাণীর সঙ্গে মিলিয়ে নিলো, যাকে সে চেনে। অর্থাৎ নতুন তথ্যটিকে তার জানা তথ্যের সাথে মিল করে সে ছাগলকে কুকুর বলল। পিঁয়াজে শিখন প্রক্রিয়ার এই ধাপকে বলছেন, আত্তীকরণ (Assimilation)। এক্ষেত্রে শিশুটি তার দেখা নতুন প্রাণীটিকে তার চেনা পুরনো প্রাণীর সঙ্গে মিলিয়ে আত্তীকরণ করেছে।

আত্তীকরণ (Assimilation)

যে জ্ঞান আমার আছে তার সাথে আরো নতুন কিছু যোগ করা-ই হলো আত্তীকরণ। আত্তীকরণের এই প্রক্রিয়ায় শিশুটি যে নিজে থেকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট তা কিন্তু নয়। সে দেখতে পাচ্ছে তার চেনা কুকুরের সঙ্গে নতুন দেখা প্রাণিটির কিছু অমিল আছে। এটা আকারে ভিন্ন, মাথায় ভিন্ন রকম কিছু একটা আছে। তাছাড়া এটি ঘেউ ঘেউ করে না। বরং ম্যা ম্যা শব্দ করে। এই বিষয়গুলো তাকে কিছুটা চিন্তায় ফেলে দেয়। এই চিন্তায় পড়ে যাওয়া শিখন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সময়ে শিশুরা বিষয়টিকে নানাভাবে নিজে থেকে ব্যাখ্যা করতে পারে। পিঁয়াজে তার গবেষণায় দেখেছেন শিশুদের কেউ কেউ একে বড় কুকুর বলেও মনে করে। শিখনের প্রক্রিয়ায় শিশুর চিন্তায় এই যে পরিবর্তন অর্থাৎ আত্তীকরণ ধারণায় যে পরিবর্তন নিয়ে এলো সেটিই সহযোজন (Accommodation)। এ সময়ে শিশুর বাবা যখন বললো ঐটি একটি ছাগল, তখন শিশু তার বাবার দেয়া নতুন তথ্যটির সাথে তার পর্যবেক্ষণকে মিলিয়ে নতুন তথ্যটি গ্রহণের জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হয় এবং এক পর্যায়ে নিজে থেকেই ছাগলকে ছাগল বলতে শেখে।

সহযোজন (Accommodation)

যে জ্ঞান আমার আছে তার সাথে নতুন তথ্যের সংযোজন করে নতুন জ্ঞান অর্জন করাই সহযোজন। উপরের উদাহরণ থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছি, শিক্ষার্থী যদি তার পূর্ববর্তী জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সংযোগ ঘটাতে না পারে, তাহলে শিক্ষার্থী কখনোই তাদের লব্ধ জ্ঞানকে পরিবর্তন করতে পারবে না। এ কারণেই পিঁয়াজে বলেছেন, শিশুর শিখন পদ্ধতিতে শিশুকে দ্বিধাদ্বন্দে ফেলতে হবে, শিশুকে চিন্তা করার সুযোগ দিতে হবে, যাতে করে সে তার পুরনো জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের আত্তীকরণ ও সহযোজন ঘটানোর মধ্য দিয়ে শিখতে পারে। তাই শিখন প্রক্রিয়ায় পরিচিত ও নতুন উভয় ধরনের উপাদানের উপস্থিতি থাকা আবশ্যক।

পিঁয়াজের তত্ত্বের জ্ঞান বিকাশের স্তরসমূহ

পিঁয়াজে মানুষের বৌদ্ধিক বা জ্ঞানমূলক বিকাশকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। এই স্তরগুলো হল,

১) ইন্দ্রীয়-পেশীয় সমন্বয় কাল (Sensorimotor Period): জন্ম থেকে ২ বৎসর

২) প্রাক প্রায়োগিক কাল (Pre-operational Period): ২ থেকে ৭ বৎসর

৩) বাস্তব প্রায়োগিক কাল (Concrete Operational Period): ৭ থেকে ১১ বৎসর

৪) রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক কাল (Operational Period): ১১ থেকে ১৫/১৬ বৎসর

১) ইন্দ্রীয়-পেশীয় সমন্বয় কাল

পিঁয়াজে তাঁর জ্ঞানমূলক বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ শুরু করেছেন একটি শিশুর জন্মাবস্থা থেকে। জন্ম থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত হল শিশুর সংবেদন ও সঞ্চালনমূলক চিন্তনের স্তর। এসময় শিশুর চিন্তা মূলত সংবেদন ও সঞ্চালনমূলক ক্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এই সময় শিশু নিজের এবং অন্যের সম্পর্কে সচেতন থাকে না। এই স্তরে শিশু তার মধ্যে যে সক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলো থাকে তার দ্বারা পরিবেশের উপর সংবেদন (sensation) সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া এই সময়ে শিশুর চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে শেখার জন্য শিশুর মধ্যে কিছু পেশীয় সঞ্চালনমূলক প্রতিক্রিয়া (motor action) করার ক্ষমতা তৈরি হয়। যেমন- কোন কিছু আঁকড়ে ধরা, চোষণ করা (sucking), আঘাত করা ইত্যাদি। এই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশ হতে থাকে। যেমন বিভিন্ন জিনিস চুষতে চুষতে সে বুঝতে শেখে কোন বস্তুগুলি চোষণযোগ্য আর কোনগুলো চোষণযোগ্য নয়, সে অনুযায়ী শিশু সেসব বস্তু মুখে দেয়। অর্থাৎ এ সময় শিশু তার পরিবেশকে তথা পৃথিবীকে জানার চেষ্টা করে কিছু ইন্দ্রিয় ও শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, আর এভাবেই শিশুর চিন্তা শক্তি বিকশিত হতে শুরু করে।

২) প্রাক প্রায়োগিক কাল

এই স্তরে শিশু যে প্রতিক্রিয়াগুলো করে তার সংবেদন ও ক্রিয়াগত (অপারেশনাল) প্রতিচ্ছবি সে তার মনে সৃষ্টি করতে পারে। যেমনঃ এ সময়ে শিশুর কাছে তার মায়ের প্রতিচ্ছবি হলো তার মায়ের সাথে তার সৃষ্টি করা বিভিন্ন সময়ের প্রতিক্রিয়া, যেমন খাওয়া, গোসল, ঘুমানো, খেলা করা ইত্যাদি। এই প্রতিচ্ছবিগুলোকে সম্পর্কযুক্ত করে সে তা সংকেত হিসেবে বিভিন্ন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া করতে ব্যবহার করে। যেমনঃ পাশের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি শিশু তার আঙ্গুলকে দুধের বোতল হিসেবে ব্যবহার (প্রতিচ্ছবি) করে তার পুতুলকে দুধ খাওয়াচ্ছে। প্রথমত: সে তার খাওয়ার প্রতিচ্ছবিকে অন্য পরিস্থিতিতে ব্যবহার করছে। দ্বিতীয়ত: বোতল হিসেবে এখানে হাতের আঙ্গুলকে প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করছে। পিয়াঁজে বলেছেন, ইন্দ্রীয়-পেশীয় সমন্বয় কালে শিশু তার বাহ্যিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে অভ্যন্তরীণভাবে করে, আর এ স্তরে শিশু তার প্রতিক্রিয়াগুলোর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিকী রূপে ব্যবহার করতে পারে। এই স্তরে শিশু ভাষাকে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। এই সময়ে শিশুর স্থান সম্পর্কে ধারণা খুব পরিষ্কার হয় না, মূলত আকৃতি, নৈকট্য, ব্যবধান ইত্যাদির মাধ্যমে সে স্থান সম্পর্কে ধারণা করে। একইভাবে সময় সম্পর্কেও শিশুর ধারণা পরিস্কার হয় না, তবে তার খাওয়া, গোসল করা, ঘুমানো, খেলা, পড়াশুনা ইত্যাদি কাজগুলি সে মোটামুটিভাবে ধারাবাহিকক্রমে সম্পন্ন করতে পারে। এ স্তরে শিশুর মধ্যে যে ধারণাগুলো তৈরী হয় সেগুলো প্রকৃত ধারণা না। তাই একে প্রাক প্রায়োগিক কাল বলা হয়।

৩) বাস্তব প্রায়োগিক কাল

এসময় শিশুরা বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চিন্তা এবং যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন ধারণা তৈরী করে। এই ধারণাগুলো বাস্তবধর্মী ও অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক, তবে তা অন্যত্র প্রয়োগ করতে পারে না। এই স্তরের মূল বৈশিষ্ট্য হল, শিশুর

সামনে কতগুলো বাস্তব তথ্য পরিবেশন করলে সেগুলোকে সে মানসিক পর্যায়ে নতুন আকৃতি দান করতে পারে। এ সময়ে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, যুক্তি শক্তির বিকাশ ঘটে, ভাষার উপলব্ধি ও ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে শুরু করে।

৪) রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক কাল

এই স্তরে কিশোর-কিশোরী এবং প্রাপ্ত বয়স্করা কোন বাস্তব উপকরণ ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমস্যা সমাধান এবং কার্যকারণ বিশ্লেষণ। এই স্তরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, ব্যক্তির বৌদ্ধিক সংগঠন (Cognitive Structure)। কোনো অনুমানকে পরীক্ষা করার জন্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করে, তা-ই বৌদ্ধিক সংগঠন। এ পর্যায়ে তারা অনুমানের ভিত্তিতে চিন্তাকে পরিচালিত করে থাকে। এই পর্যায়ে ব্যক্তি নিজের চিন্তাকে বিভিন্নভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে।

শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ তার maturity এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ শিশুর চিন্তা-ভাবনার পরিপক্বতা ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠে, যেমন দাঁড়াতে শেখার পরই সে দৌড়াতে পারে। তাই বড়দের মতো ভাবতে শেখার পূর্বে তাকে শিশু-সুলভ চিন্তার ধাপগুলো স্বাভাবিকভাবেই অতিক্রম করতে হয়। পিয়াজের এই মতবাদ শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিশুর শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা থাকলে শিক্ষক সহজেই উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন এবং শ্রেণিকক্ষে বা বাইরে শিশুকে তার বিকাশ-পর্যায়ের আলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

শিশুর শিখনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে পিঁয়াজের তত্ত্বের ভূমিকা

১. শিশুর বয়স ও বিকাশস্তর অনুযায়ী শিখন পরিকল্পনা

পিঁয়াজের তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুদের চিন্তা করার ক্ষমতা তার বয়স ও বিকাশস্তরের সঙ্গে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায়। তাই সব বয়সের শিশুকে একইভাবে শেখানো সম্ভব নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্ব শিক্ষকদের শিশুর মানসিক পরিপক্কতা বিবেচনা করে শিখন পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। ছোট বয়সে বাস্তব বস্তু, ছবি, খেলা ও হাতে-কলমে কার্যক্রমের মাধ্যমে শেখানো এবং বড় বয়সে ধীরে ধীরে যুক্তিনির্ভর ও বিমূর্ত ধারণা উপস্থাপন করা শিখনকে কার্যকর করে তোলে।

২. সক্রিয় ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনে গুরুত্ব প্রদান

এই তত্ত্বে শিখনকে একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, যেখানে শিশু নিজে কাজ করে, পর্যবেক্ষণ করে ও চিন্তা করে জ্ঞান গঠন করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে মুখস্থনির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও অনুসন্ধানমূলক শিখনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষক শিশুকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন এবং পূর্ববর্তী জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সংযোগ ঘটাতে সহায়তা করেন, ফলে শিখন হয় গভীর ও স্থায়ী।

৩. শিক্ষকের ভূমিকা নির্ধারণে দিকনির্দেশনা প্রদান

পিঁয়াজের তত্ত্ব শিক্ষকের ভূমিকাকে নির্দেশনামূলক নয়, বরং সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে। শিক্ষক শিশুর চিন্তায় দ্বিধা বা কৌতূহল সৃষ্টি করে তাকে ভাবতে শেখান এবং নিজে থেকে সমাধানে পৌঁছাতে সহায়তা করেন। শিশুর বিকাশস্তর সম্পর্কে সচেতন শিক্ষক উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারেন, যার ফলে শিখন হয় শিশুকেন্দ্রিক, আনন্দময় ও বিকাশ উপযোগী।

লেভ ভিগটস্কি (Lev Vygotsky) এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব

সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্বের প্রবর্তক বিখ্যাত রাশান মনোবিজ্ঞানী লেভ-ভিগটস্কি (১৮৯৬-১৯৩৪) তার তত্ত্বে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সাথে সমাজ ও সংস্কৃতির যে নিবিড় যোগসূত্র আছে, তা ব্যাখ্যা করেছেন। ভিগটস্কি মনে করেন যে, শিশুরা সক্রিয় কাজের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে এবং এই জ্ঞান শুধুমাত্র হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে নয়, বরং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়। আর এই অভিজ্ঞতাগুলো শিশু পেয়ে থাকে তার চারপাশের সামাজিক কর্মকান্ড থেকে। যেমন: একটি শিশু যখন তার সমবয়সী বা বড়দের সাথে মিশে, তখন সে তার সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন মূল্যবোধ, রীতিনীতি, বিশ্বাস ও ভাষা শেখে। ভিগটস্কির মতে শিশুর এই শিখনের ধারা বা বিকাশ নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে তার মিথস্ক্রিয়া এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর। যেহেতু সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার দ্বারা শিশুর শিখনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়। তাই ভিগটস্কি তার তত্ত্বে শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং বৃহত্তর সমাজের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ভিগটস্কির তত্ত্বের মূল ধারণা:

১.সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction):

সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে ভিগটস্কি বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মৌলিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক শিক্ষার হাত ধরেই শিশুর বিকাশ ঘটে। তিনি বলেন, "শিশুর সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতিটি কর্মকান্ড শিশুকে দুইভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত সামাজিক পর্যায়ে - বিভিন্ন ব্যক্তির মাঝে, এরপর শিশুর নিজের মাঝে।" অর্থাৎ শিশুর আভ্যন্তরীণ মানসিক প্রক্রিয়া বা চিন্তা করার দক্ষতা, তার ভাষা, পরিবার, সমাজ ও স্কুলের বিভিন্ন কথোপকথন ও কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে। সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব শিশুর মানসিক/ চিন্তন প্রক্রিয়াকে আকৃতি দান করে এবং শিশুর উচ্চস্তরের মানসিক চিন্তা তার সামাজিক কর্মকান্ডের ফসল। শিশুর শিখনে এবং জ্ঞানমূলক বিকাশে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা ভাষার ফলশ্রুতিতেই চিন্তার উদ্রেগ ঘটে এবং চিন্তা থেকেই শিশুর মাঝে অভ্যন্তরীণ কথা তৈরী হয়। অভ্যন্তরীণ কথার সাহায্যে শিশু তার কাজকে, তার চিন্তাকে সঠিকপথে পরিচালিত করে যা সাধারণত শিশুর স্কুল বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

২. বিকাশের প্রান্তিক অবস্থান (Zone of Proximal Development) (ZPD):

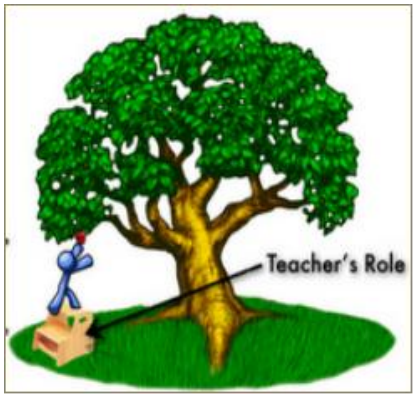

ভিগটস্কির তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল, বিকাশের প্রান্তিক অবস্থান (ZPD)। শিশুর একা কোন কাজ করার সামর্থ্য এবং অন্যের সাহায্য নিয়ে কাজ করার সামর্থের মধ্যে যে এলাকা তা-ই ZPD। শিশুর শিখনকে যদি একটি স্কেলের সাথে তুলনা করি, তাহলে এই স্কেলের কোন একটি পয়েন্টে শিশুর বর্তমান যোগ্যতাগুলো (current abilities) আছে, যা সে নিজে নিজে সম্পন্ন করতে পারে। আর এর উপরে আরও কিছু যোগ্যতা আছে, যা শিশুর সামর্থ্য বা চিন্তা ক্ষমতার কিছুটা উপরে। এদেরকে বলা হয় শিশুর সম্ভাব্য ক্ষমতা (potential abilities), যা সে একা একা করতে পারে না। কিন্তু যদি পিতামাতা বা শিক্ষক সূত্র ধরিয়ে দেন, বা প্রশ্ন করে সমাধান খুঁজতে সাহায্য করেন, তবে কখনও কখনও সেই কাজগুলো শিশুর জন্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এই যে শিশুর বর্তমান যোগ্যতা এবং সম্ভাব্য ক্ষমতা এর মধ্যবর্তী যে এলাকা বা যে দূরত্ব এটাই ZPD। ভিগটস্কির মতে এই বিকাশের প্রান্তিক অবস্থানের মাঝেই শিশুর শিখন ঘটে এবং এটি সর্বদা পরিবর্তনশীল।

৩. অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি (More Knowledgeable Others) (MKO):

কোন একটি কাজ যে শিখছে, তার চেয়ে অধিক জ্ঞান সম্পন্ন যেকোন ব্যক্তিই হল MKO। সাধারণত মনে করা হয় যে, শিক্ষক, বাবা-মা বা বড় কেউ MKO হবেন, কিন্তু যে কেউই MKO হতে পারে, যেমন, সহপাঠী, বয়সে ছোট কোন ব্যক্তি, এমনকি কম্পিউটারও MKO হতে পারে। ভিগটস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী ZPD এর কিছু কাজ আছে, যা সম্পন্ন করতে শিশু MKO এর কাছ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকে, এই প্রয়োজনীয় সহযোগিতাই হল দৃঢ়ীকরণ বা scaffolding। কখনও সরাসরি সমাধান করে, কখনও পরোক্ষভাবে প্রশ্ন করে বা ক্লু দিয়ে স্ক্যাফোল্ডিং করা যেতে পারে। যেমন: একজন শিক্ষক একটি পাজল (puzzle) মিলিয়ে দেখাতে পারেন, কীভাবে রঙ ও আকার-আকৃতি মিলিয়ে puzzle এর খেলাটি খেলতে হবে। আবার কোন রঙের সাথে কোন রঙ মিলে এইভাবে প্রশ্ন করেও শিশুকে puzzle মিলাতে সাহায্য করতে পারেন। স্ক্যাফোল্ডিং মূলত শিশুর শেখাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সহযোগিতা, যার উপর ভিত্তি করে শিশু নিজের ভেতরের সুপ্ত জানাগুলোকে জাগিয়ে তুলতে পারে। প্রয়োজনীয় সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে কথোপকথন।

শিশুর শিখনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে লেভ ভিগটস্কির তত্ত্বের ভূমিকা

এককভাবে শেখার চেয়ে শিশুরা যখন দলীয়ভাবে কিছু শেখে, তখন তাদের মাঝে শেখার আগ্রহ এবং বিশ্লেষণ মূলক চিন্তা করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। যে কাজগুলো শিশুরা নিজেরা একা করতে পারে না, সেই কাজগুলো চিহ্নিত করে, অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বা MKO এর সহযোগীতার ব্যবস্থা করা, যাতে শিশুর মাঝে যে সুপ্ত যোগ্যতা আছে, তা জাগিয়ে তোলা যায়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় MKO এর ভূমিকাকে অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়, কেননা MKO এর যোগ্যতার উপর-ই শিশুর শেখার পরিসর কতটা বাড়বে, তা নির্ভর করে। শিশুর শিখনের জন্য শুরুতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে, পরে যখন শিশুর যোগ্যতা এবং নিজের প্রতি আস্থা তৈরী হবে, তখন ধীরে ধীরে সহযোগীতার ক্ষেত্র কমিয়ে দিতে হবে বা পরিবর্তন করতে হবে। ভিগটস্কি মনে করেন, শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সর্বদা গতিশীল এবং যথাযথ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সহযেগিতা এবং নির্দেশনা তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই কারণে ছোট শিশুদের জন্য পরিবার, শিক্ষক এবং লালন-পালনকারিদের দায়িত্ব শিশুর জন্য পর্যাপ্ত সামাজিক মেলামেশার সুযোগ তৈরী করা এবং যথাযথ সহযোগীতার ব্যবস্থা করা।

১. সামাজিক মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক শিখনে গুরুত্ব প্রদান

ভিগটস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর শিখন প্রধানত সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। শিক্ষাক্ষেত্রে এর অর্থ হলো-শিশুকে একা একা শেখার পরিবর্তে দলীয় কাজ, জোড়ায় কাজ, আলোচনা ও কথোপকথনের সুযোগ দিতে হবে। সহপাঠী, শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ শিশুর চিন্তা, ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

২. Zone of Proximal Development (ZPD) অনুযায়ী পাঠদান

শিক্ষাক্ষেত্রে ভিগটস্কির তত্ত্ব শিক্ষকদের শেখায় যে, শিশুকে এমন কাজে সাহায্য করতে হবে যা সে পুরোপুরি একা করতে পারে না, কিন্তু সামান্য সহায়তা পেলে করতে সক্ষম। এই ZPD -এর মধ্যে পাঠদান করলে শিশুর শেখার সম্ভাবনা সর্বাধিক হয়। এতে শিশু ধাপে ধাপে নিজের বর্তমান সক্ষমতা অতিক্রম করে নতুন দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

৩. অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির (MKO) ভূমিকার স্বীকৃতি

এই তত্ত্বে শিক্ষক, অভিভাবক, সহপাঠী বা অন্য যেকোনো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে শিশুর শেখার সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হলো—শিশুর পাশে এমন কাউকে রাখা, যিনি প্রয়োজন অনুযায়ী দিকনির্দেশনা, ইঙ্গিত বা সহায়তা দিতে পারবেন। এতে শিশুর আত্মবিশ্বাস ও শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

৪. স্ক্যাফোল্ডিংয়ের মাধ্যমে ধাপে ধাপে শেখানো

ভিগটস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষকের উচিত শুরুতে শিশুকে বেশি সহায়তা দেওয়া এবং ধীরে ধীরে সেই সহায়তা কমিয়ে আনা। এই স্ক্যাফোল্ডিং প্রক্রিয়ায় শিশু নিজে চিন্তা করতে শেখে এবং ধীরে ধীরে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। ফলে শেখা হয় গভীর ও টেকসই।

৫. ভাষা ও কথোপকথনের মাধ্যমে চিন্তার বিকাশ

ভিগটস্কি ভাষাকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই শিশুকে কথা বলার, নিজের মত প্রকাশের, প্রশ্ন করার ও আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া জরুরি। ভাষার ব্যবহার শিশুর চিন্তাকে সংগঠিত করে এবং অভ্যন্তরীণ চিন্তন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে।

৬. শিশুকেন্দ্রিক ও সহযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা

ভিগটস্কির তত্ত্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে শিশুকেন্দ্রিক ও সহযোগিতামূলক করতে সহায়তা করে। এখানে শিক্ষক নিয়ন্ত্রক নন, বরং পথপ্রদর্শক। শিশুর সামাজিক অভিজ্ঞতা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখনকে এগিয়ে নেওয়াই এই তত্ত্বের মূল প্রয়োগ।

শিশুর আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা গঠনে ভিগটস্কির তত্ত্বের গুরুত্ব

ভিগটস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব অনুযায়ী শিখনের শুরুতে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি (MKO) শিশুকে প্রয়োজনীয় সহায়তা বা স্ক্যাফোল্ডিং প্রদান করে। তবে এই সহায়তা সবসময় দেওয়া উচিত নয়। কারণ অতিরিক্ত বা দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা শিশুর স্বনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস গঠনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ভিগটস্কির তত্ত্ব আমাদের স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয় যে, স্ক্যাফোল্ডিং হতে হবে সময়োপযোগী, নমনীয় এবং ধীরে ধীরে হ্রাসযোগ্য। যখন শিশু MKO -এর সহায়তায় কোনো কাজ বারবার করতে সক্ষম হয় এবং ধীরে ধীরে নিজে নিজে সেই কাজ সম্পন্ন করার লক্ষণ দেখা যায়, তখন MKO -এর উচিত পেছনে সরে আসা। এই পর্যায়ে সহায়তা কমিয়ে দেওয়া, সরাসরি সমাধান না দিয়ে কেবল ইঙ্গিত বা প্রশ্নের মাধ্যমে সাহায্য করা জরুরি। এতে শিশু নিজের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা অর্জন করে।

ভিগটস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী ZPD সবসময় পরিবর্তনশীল। আজ যে কাজটি শিশুর জন্য কঠিন, আগামীকাল সেটিই তার বর্তমান সক্ষমতার অংশ হয়ে উঠতে পারে। তাই MKO যদি সঠিক সময়ে সরে না আসে, তবে শিশুর সম্ভাব্য ক্ষমতা বাস্তব সক্ষমতায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়। স্ক্যাফোল্ডিংয়ের উদ্দেশ্য শিশুকে নির্ভরশীল করে রাখা নয়, বরং তাকে স্বনির্ভর করে তোলা।

এই তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে-শিক্ষক বা অভিভাবকের ভূমিকা হলো শিশুকে ধীরে ধীরে নিজের শেখার দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে সহায়তা করা। প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দেওয়া এবং সঠিক সময়ে সেই সহায়তা প্রত্যাহার করাই শিশুর আত্মবিশ্বাস, সমস্যা সমাধান দক্ষতা ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশে সহায়ক হয়। সুতরাং, ভিগটস্কির তত্ত্ব

কেবল সহযোগিতার গুরুত্বই তুলে ধরে না, বরং কখন সহযোগিতা কমিয়ে আনতে হবে, সেই বোধও তৈরি করে। এই ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকার মাধ্যমেই শিশুর শিখন হয় কার্যকর, টেকসই এবং আত্মবিশ্বাসভিত্তিক।

ব্রনফেনব্রেনার (Urie Bronfenbrenner) এর বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব

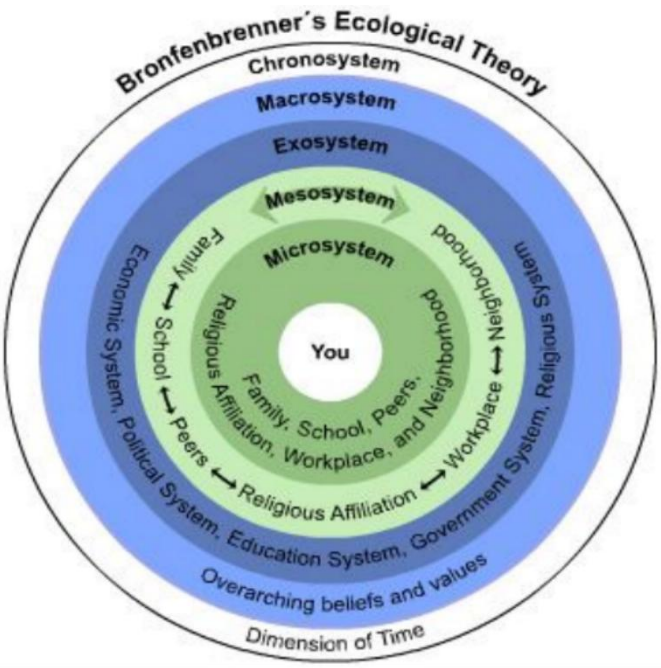

ব্রনফেনব্রেনার (এপ্রিল ২৯, ১৯১৭ - সেপ্টেম্বর ২৫, ২০০৫) প্রদত্ত বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা বর্ণনা করেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশু যে পরিবেশে বাস করে তার একটি প্রভাব শিশুর উপর থাকে। এখানে পরিবেশ বলতে শুধু শিশুর পারিবারিক পরিবেশের কথা বলা হয়নি। বরং তার চারপাশে যে পরিবেশ, যেমন তার পরিবার, সহপাঠী ও খেলার সাথী, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন এবং নানা ধরনের সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন যা তাকে প্রভাবিত করে তার সবকিছুর কথাই বলা হয়েছে। তত্ত্বটিতে মানব উন্নয়নের ধারাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পরিবার, স্থানীয় সামাজিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিদ্যালয়, গণমাধ্যম (রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন) রাষ্ট্র এবং বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এসব কিছুই শিশুর বিকাশের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বে শিশু, তার পরিবেশের সাথে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে তা আলোচনা করা হয়েছে। একটি চক্রের মাধ্যমে ব্রনফেনব্রেনার মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করেছেন।

মাইক্রো সিস্টেম

ব্রনফেনব্রেনারের মানব উন্নয়ন চক্রের প্রথম ধাপ বা স্তর হল মাইক্রো সিস্টেম। এই স্তরে শিশু সরাসরি তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, যেখানে সে বাস করে তার সংস্পর্শে থাকে। এই স্তরটি পরিবেশের প্রভাব, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সহযোগে গঠিত। পরিবার, শিশু সেবাদানকারী, সহকারী, বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিশু চিকিৎসা সেবা, সামাজিক সেবা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। শিশুরা সরাসরি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও শিশু কর্তৃক সরাসরি প্রভাবিত হয়। যেমন: শিশু তার পরিবারের লোকজন, বিদ্যালয়, শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধবের সংস্পর্শে আসে এবং বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। একইভাবে শিশুর আচরণের ফলে তাদেরও মানসিক পরিবর্তন আসে। শিশুর সামাজিক আচরণ শিক্ষকের নির্দিষ্ট ধরনের কর্মকান্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়; একইভাবে, শিক্ষক কী করবেন সেটি শিশুর আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

মেসো সিস্টেম

ব্রনফেনব্রেনার বলেন, মাইক্রো সিস্টেমে একজন দ্বারা অন্যজনের প্রভাবিত হওয়ার মাধ্যমে বা পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কারণেই বাস্তুবিদ্যার দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দুইটি মাইক্রোসিস্টেমের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা যোগাযোগ, তাই মেসো সিস্টেম। যেমন: পরিবার ও স্কুলের মাঝে যে যোগাযোগ, মসজিদ ও পরিবারের মধ্যে যে যোগাযোগ আবার সহপাঠী ও পরিবারের মাঝে যে যোগাযোগ, তা-ই মেসো সিস্টেম। একটি শিশু যখন পারিবারিকভাবে নির্যাতনের স্বীকার হয়, তখন

তার স্কুলের কর্মকান্ডও ব্যহত হয়। আবার একইভাবে খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশার কারণে পরিবারে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। মেসো সিস্টেমের মাধ্যমে একটি সম্পর্কের শক্ত ভিত গড়ে উঠে। মেসো সিস্টেমে যখন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে দৃঢ় সহযোগিতা এবং যোগাযোগ বর্তমান থাকে তখন বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বানুযায়ী শিশু উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

এক্সো সিস্টেম

শিশুর উন্নয়নের উপর প্রভাবকারী পরিবেশের এই ধাপ (এক্সো-সিস্টেম) যা কিনা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরস্পর সংযুক্তি তৈরি করে বটে তবে তা শিশুর জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে না। কিন্তু পরোক্ষভাবে তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। দেখা যায় যে, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা পদ্ধতি, সরকারি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে শিশুর সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তা না করলেও শিশুর পরিবার, পিতামাতাকে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সহায়তা করে যা পরোক্ষভাবে শিশুর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন: অভিভাবকের কর্মঅভিজ্ঞতা শিশু বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। সরকারিভাবে নির্মিত পার্ক, লাইব্রেরিও শিশু বিকাশে ভূমিকা রাখে।

ম্যাক্রো সিস্টেম

ম্যাক্রো সিস্টেম হলো এই চক্রের শেষ বা চূড়ান্ত ধাপ। এখানে মূলত সমাজে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আদর্শের দিকগুলোর কথা বলা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শিশুর উন্নয়নে এর সংশ্লিষ্টতা নেই কিন্তু বাস্তবে শিশুর সার্বিক উন্নয়নে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। যেমন যে সমাজে শিশু নির্যাতনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় সেখানে শিশু-নির্যাতনের ঘটনা কম ঘটে। একইভাবে যে সমাজ বা রাষ্ট্র শিশুর বিকাশের উপযোগী আইন তৈরি করে সেখানে শিশু যেভাবে বেড়ে উঠবে, যেখানে এ ধরনের আইন নেই সেখানে অন্যভাবে বেড়ে উঠবে।

ক্রোনো সিস্টেম

এটি ব্রনফেনব্রেনার কর্তৃক প্রদত্ত কোন ধাপ নয়। পরবর্তীতে বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বের ধাপগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, শিশু এসব ধাপ দ্বারা সৃষ্ট প্রভাবের বাইরেও কোন ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যেমন: পারিবারিক বিপর্যয়, সামাজিক বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিষয়গুলো শিশুকে প্রভাবিত করে। যখন বাবা-মায়ের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে অথবা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয়, তখন শিশু মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। এসব ঘটনাবলীকে ক্রোনো সিস্টেমের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

শিশুর শিখনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রনফেনব্রেনারের বাস্তুবিদ্যা তত্ত্বের ভূমিকা

১. শিশুর শিখনকে বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝাতে সহায়তা করে

এই তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে যে শিশুর শিখন কেবল শ্রেণিকক্ষ বা পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং পরিবার, সহপাঠী, শিক্ষক, সমাজ, গণমাধ্যম, রাষ্ট্রীয় নীতি ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রভাব শিশুর শিখনে কাজ করে। ফলে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকরা শিশুর শিখন সমস্যাকে এককভাবে না দেখে সামগ্রিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

২. পরিবার ও বিদ্যালয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে

মাইক্রো ও মেসো সিস্টেমের আলোকে এই তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। শিশুর শিখন তখনই কার্যকর হয় যখন পরিবারে যে মূল্যবোধ, আচরণ ও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, তা বিদ্যালয়ের পাঠদান ও শৃঙ্খলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। এতে শিশুর শেখার ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

৩. শিক্ষকের ভূমিকা সম্প্রসারণে দিকনির্দেশনা দেয়

এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষক শুধু পাঠদানকারী নন, বরং শিশুর পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা বোঝার একজন গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। শিশুর পারিবারিক অবস্থা, সামাজিক অভিজ্ঞতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা বা সাংস্কৃতিক পটভূমি বিবেচনায় নিয়ে পাঠদান করলে শিখন আরও অর্থবহ হয়। এতে শিক্ষক শিশুকেন্দ্রিক ও সহানুভূতিশীল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

৪. শিক্ষা নীতি ও ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করে

এক্সো ও ম্যাক্রো সিস্টেমের মাধ্যমে এই তত্ত্ব শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনার ওপর গুরুত্ব দেয়। পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসেবা ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সবকিছুই শিশুর শিখনে প্রভাব ফেলে বলে এই তত্ত্ব শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সমন্বিতভাবে ভাবতে সাহায্য করে।

৫. ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিকূল অবস্থার শিশুদের শিখনে সহায়তা পরিকল্পনায় কার্যকর

বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব শিশুর শিখনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন পরিবেশগত ঝুঁকি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। একইসাথে এটি পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে রক্ষাকবচমূলক উপাদান চিহ্নিত করে শিশুর শিখন ও বিকাশকে সহায়তা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৬. পরিবর্তনশীল সময় ও ঘটনার প্রভাব বিবেচনায় আনতে সহায়ক

ক্রোনো সিস্টেমের ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর জীবনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন পারিবারিক পরিবর্তন, সামাজিক বিপর্যয় বা দীর্ঘমেয়াদি সংকট-এসবের প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর শিখন চাহিদা অনুযায়ী সময়োপযোগী সহায়তা পরিকল্পনা করতে পারে।

বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বটি সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল। এটা শুধু সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকেই গ্রহণ করে না বরং ভিন্নতাকে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত করার চেষ্টা করে। তত্ত্বটিতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ব্রনফেনব্রেনারের এই তত্ত্বটি শিশু উন্নয়নে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা, নীতি নির্ধারক, এর সমর্থক ও কর্মীদের কাছে জনপ্রিয় একটি মডেল। কারণ এখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ব্রনফেনব্রেনারের বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর শিখনকে একটি সমন্বিত, পরিবেশ-নির্ভর ও গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে বুঝতে সহায়তা করে। এই তত্ত্ব অনুসরণ করলে শিশুর শিখন, আচরণ ও সামগ্রিক বিকাশকে আরও বাস্তবসম্মত, সংবেদনশীল এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

শিখনের আচরণবাদ তত্ত্ব (Behavioral Learning Theories)

আচরণবাদ মনোবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যেখানে শিখন বলতে বোঝায় পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণের পরিবর্তন। শিখনের আচরণবাদ তত্ত্ব অনুসারে শিখনের পরিবর্তন ঘটে বাহ্যিক উদ্দীপনা (external stimuli) এবং তার পরিণতির মাধ্যমে, অর্থাৎ যেসব আচরণ পর্যবেক্ষণযোগ্য সেগুলোর প্রতিক্রিয়ার (response) ওপর ভিত্তি করে শিখন ব্যাখ্যা করা হয়। মানুষ বা প্রাণী যেভাবে উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া এবং পুরস্কার/শাস্তিই (consequences) হলো আচরণবাদ তত্ত্বের আসল ভিত্তি।

আচরণবাদের (Behaviorism) মৌলিক অনুমানসমূহ

১. শিক্ষার্থীকে সঠিক প্রতিক্রিয়া দিতে জানতে হবে: কখন, কোন পরিস্থিতিতে, কীভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে হবে।
২. সঠিক আচরণকে জোরদার করতে হবে: ফলাফল বা পরিণতির মাধ্যমে শেখানো।
৩. শিখনের লক্ষ্য হলো দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষা: প্রশিক্ষণ, কাজ-কেন্দ্রিক দক্ষতা অর্জন।
৪. আদর্শ (standard) পাঠ্যক্রম: আনুষ্ঠানিক স্কুলব্যবস্থা, এবং সকলের একই ধরনের ফলাফল প্রত্যাশা।
৫. মানসিক প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না: কেবল দৃশ্যমান আচরণকেই শিখন হিসেবে গণ্য করা হয়।

শিখনের আচরণবাদের দুটি মূল তত্ত্ব

শিখনের আচরণবাদের দুই প্রধান মনোবিজ্ঞানী ইভান পাভলভ এবং বি. এফ. স্কিনার। এই দুই গবেষক মানুষ ও প্রাণী আচরণ কিভাবে শিখে এবং গড়ে ওঠে, তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যাখ্যা করেছেন। ইভান পাভলভের প্রাচীন সাপেক্ষণ (Classical Conditioning) তত্ত্বের মূল বিষয় হলো স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াকে নতুন উদ্দীপনার সাথে যুক্ত করা। বি. এফ. স্কিনারের করণ সাপেক্ষণ (Operant Conditioning) তত্ত্বের মূল বিষয় হলো ইচ্ছাকৃত, লক্ষ্যনির্দিষ্ট আচরণকে শক্তিশালী করতে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবহার।

ইভান পাভলভের প্রাচীন সাপেক্ষণ তত্ত্ব (Classical Conditioning Theory)

পাভলভ একজন রাশিয়ান ফিজিওলজিস্ট যিনি মূলত পরিপাকতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত আচরণগত শিক্ষার একটি বিশিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করেন যা প্রাচীন সাপেক্ষণ নামে পরিচিত হয়। পাভলভ কুকুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখান কীভাবে একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (salivation) নতুন উদ্দীপনার (bell) সাথে যুক্ত হয়ে শিখন ঘটে।

পাভলভের কুকুর নিয়ে পরীক্ষণ

প্যাভলভ তার পরীক্ষণটি একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের ওপর করেছিলেন। তিনি পরিক্ষণটি করার জন্য পরীক্ষাগারটিকে এমনভাবে সজ্জিত করেন যাতে যান্ত্রিক উপায়ে মাংস কুকুরের মুখে পরিবেশন করা সম্ভব হয় এবং পরীক্ষক একটি কক্ষ থেকে সবকিছুই দেখতে পান। তবে কুকুরটি পরীক্ষককে দেখতে না পায়। পরীক্ষণের শুরুতে মেট্রোনোম নামক এক ধরনের পরিমাপক ঘড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়। কুকুরটিকে প্রথমে ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনানো হয়। দেখা গেল টিক টিক শব্দ শুনে কুকুরটি প্রথমে কান খাড়া করে, তবে লালাক্ষরণ করে না। এক্ষেত্রে টিক টিক শব্দটি নিরপেক্ষ উদ্দীপক (Neutral stimulus)। কয়েক সেকেন্ড পরে কুকুরটিকে মাংস দেয়া হলো। দেখা গেল, এখন লালা নির্গত হচ্ছে এবং ঐ লালা পরিমাপক বোতলটিতে গিয়ে জমা হচ্ছে।

এখানে ক্ষুধার্ত কুকুরটির কাছে মাংস ছিল স্বাভাবিক উদ্দীপক (Unconditioned stimulus) এবং লালাক্ষরগ ছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (Unconditioned response)। পরীক্ষক এরপর প্রথমে টিক টিক শব্দ শোনানোর পর পরই কুকুরটিকে মাংস দেওয়া শুরু করলেন। বেশ কয়েকবার টিক টিক শব্দের পর পরই কুকুরটিকে মাংস দেওয়ার এক পর্যায়ে দেখা গেল মাংস না দিলেও শুধুমাত্র টিক টিক শব্দ শুনা মাত্রই কুকুরটির মুখ থেকে লালা নির্গত হচ্ছে। এখানে টিক টিক শব্দটিই হচ্ছে সাপেক্ষ উদ্দীপক (Conditioned stimulus) এবং এই টিক টিক শব্দটিকে মাংসের সাথে উপস্থাপন করে সাপেক্ষীকরণ (Conditioned) করা হয়েছে।

পাভলভের কুকুর নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল

১ম ধাপ: স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (Natural Response)

খাবার (Unconditioned Stimulus) দেখলে কুকুরের মুখে লালা নিঃসরণ (Unconditioned Response) হতো। এটি একটি স্বয়ংক্রিয় ও প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া।

২য় ধাপ: খাবার এবং ঘণ্টা

খাবার দেওয়ার সময় পাভলভ ঘণ্টা বাজাতেন। কিছুদিন পর খাবার দেখানোর আগে শুধু ঘণ্টার শব্দ দিয়েই কুকুরের মুখে লালা আসতে লাগল।

৩য় ধাপ: সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response)

ঘণ্টা (Conditioned Stimulus) বাজালেই কুকুরের লালা নিঃসরণ (Conditioned Response) হতে লাগলো। সুতরাং, একটি নতুন উদ্দীপনা (ঘণ্টা) পুরোনো স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার সাথে মিলিত হয়ে নতুন আচরণ তৈরি করল।

পাভলভের তত্ত্বের মূল ধারণা

- উদ্দীপনা–প্রতিক্রিয়ার সংযোগ (Stimulus-Response Link): নতুন উদ্দীপনা পুরোনো প্রতিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হয়।
- সাপেক্ষণ (Conditioning): কোনো নিরপেক্ষ উদ্দীপনা (neutral stimulus) বারবার শক্তিশালী উদ্দীপনার সাথে যুক্ত হলে শিখন ঘটে।
- স্বয়ংক্রিয় (automatic) প্রতিক্রিয়া: এটি সচেতন চিন্তা ছাড়াই ঘটে।

শিক্ষায় প্রাচীন সাপেক্ষণের প্রয়োগ

১. ভয় ও নেতিবাচক মনোভাব গঠনের ব্যাখ্যা

শিশুকালে কোনো শিক্ষক, বিষয় বা পরিবেশের সাথে নেতিবাচক অভিজ্ঞতা যুক্ত হলে তা দীর্ঘমেয়াদি ভয় বা অনীহা তৈরি করতে পারে। যেমন-রূঢ় আচরণকারী ইংরেজি শিক্ষকের সাথে ভয়ের অনুভূতি যুক্ত হলে পরবর্তীতে ইংরেজি বিষয়টির প্রতিও ভয় জন্মাতে পারে। এটি প্রাচীন সাপেক্ষণের একটি বাস্তব উদাহরণ। ইতিবাচক আচরণ, সহানুভূতিশীল ভাষা ও উৎসাহমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে শেখার সাথে সুখকর অভিজ্ঞতা যুক্ত করাই এক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল করণীয়।

২. পরীক্ষা ভীতি কমাতে সহায়তা

অনেক শিক্ষার্থীর কাছে পরীক্ষা একটি ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে, কারণ পরীক্ষার সাথে চাপ ও ব্যর্থতার অনুভূতি সাপেক্ষিত হয়ে গেছে। এই তত্ত্বের আলোকে ধাপে ধাপে ইতিবাচক সাপেক্ষণ তৈরি করা সম্ভব-

- সহজ ও ছোট কাজ দিয়ে শুরু করা
- নম্বরবিহীন (ungraded) অনুশীলন
- ধীরে ধীরে সহজ নম্বরযুক্ত (graded) মূল্যায়ন
- পর্যাপ্ত সময় ও সহায়ক পরিবেশ প্রদান

এর ফলে পরীক্ষার সাথে ইতিবাচক অনুভূতি যুক্ত হয় এবং ভয় কমে যায়।

৩. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন সাপেক্ষণ শ্রেণিকক্ষ পরিচালনায় কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন-

- ক্লাস শুরুতে নির্দিষ্ট ঘণ্টা বা সিগন্যাল দিলে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই শান্ত হয়ে যায়
- নির্দিষ্ট সংকেতে কাজ শুরু বা শেষ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে
- ইতিবাচক পরিবেশের সাথে শেখার কার্যক্রম যুক্ত হলে শিখনের প্রতি আগ্রহ বাড়ে

৪. ইতিবাচক শিখন পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক

আনন্দময় কণ্ঠস্বর, হাসিমুখ, প্রশংসা ও উৎসাহ যদি নিয়মিত শেখার কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে শেখার প্রতি শিশুর ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। এতে শিখন হয় সহজ, আনন্দদায়ক ও স্থায়ী।

৫. আচরণ সংশোধনে ভূমিকা

অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের সাথে নেতিবাচক উদ্দীপনা এবং কাঙ্ক্ষিত আচরণের সাথে ইতিবাচক উদ্দীপনা যুক্ত করে শিশুর আচরণ ধীরে ধীরে পরিবর্তন করা সম্ভব।

পাভলভের প্রাচীন সাপেক্ষণ তত্ত্ব শিশুর শিখন ও আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ও কার্যকর তত্ত্ব। এটি দেখায় যে শিখন কেবল জ্ঞানার্জনের বিষয় নয়, বরং আবেগ, অভ্যাস ও পরিবেশের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্বের সচেতন প্রয়োগ শিশুদের ভয় কমিয়ে আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক শিখন মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

বি. এফ. স্কিনার (BF Skinner) এর করণ সাপেক্ষণ (Operant Conditioning)

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী স্কিনার পাভলভের কাজকে সম্প্রসারণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের বেশিরভাগ আচরণ ইচ্ছাকৃত (voluntary) এবং এর গঠন হয় পরিণতি (consequence) দ্বারা। স্কিনার বলেন, যে কোনো আচরণের ফলাফল নতুন আচরণ শেখায়। অর্থাৎ, ভালো আচরণের পর পুরস্কার (reinforcement) দিলে আচরণ বাড়ে আর খারাপ আচরণের পর শাস্তি (punishment) দিলে সেই আচরণ কমে। তিনি ইঁদুর, কবুতর ইত্যাদির উপর পরীক্ষা করে দেখান যে কিভাবে পুরস্কার/শাস্তি ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত আচরণকে শক্তিশালী করা যায়। এটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিভাবকের কাছে খুবই জনপ্রিয় যেহেতু এটি ব্যবহার করা সহজ।

স্কিনারের পরীক্ষণ

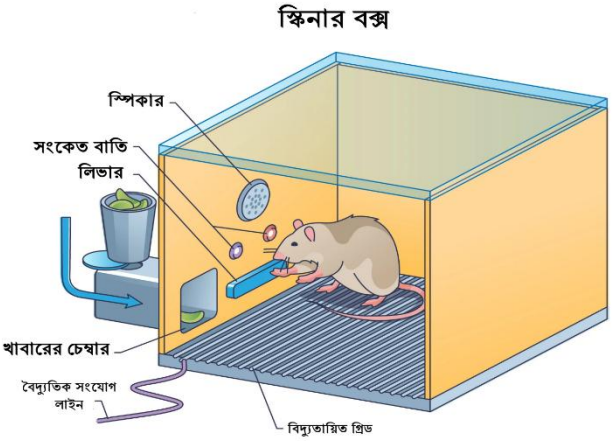

বি. এফ. স্কিনার একটি ক্ষুধার্ত ইদুর নিয়ে তাঁর পরীক্ষণটি করেন। পরীক্ষণটি করার জন্য তিনি একটি বাক্স বা খাঁচা ব্যবহার করেন যাকে বলা হয় স্কিনার বক্স (Skinner Box)। এই বক্সের ভিতরে এক পাশে একটি চাবি আছে। চাবিটিতে চাপ দিলে বক্সের ভিতর নির্দিষ্ট একটা পাত্রে খাদ্য যান্ত্রিক উপায়ে উপস্থিত হয়। খাবার খোঁজার জন্য ক্ষুধার্ত ইঁদুরটি খাঁচার ভেতর ছুটোছুটি করার সময় হঠাৎ একবার চাবিতে চাপ পড়ে যায়। চাবিতে চাপ পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে খাঁচার ভেতর খাবার চলে আসে এবং ইঁদুরটি খাবার খায়। তবে ইঁদুরটি প্রথমে খেয়ালই করেনি যে, চাবিতে চাপ দেওয়াতে খাবার এসেছে। এরপর ইঁদুর খাবারের আশায় আবার ছুটোছুটি করতে লাগলো। এভাবে দ্বিতীয়বার হঠাৎ করে চাবিতে পড়ার সাথে সাথে আবার খাবার আসলো। তৃতীয়বারও ইঁদুরটি দৈবক্রমে চাবিতে চাপ দিল এবং খাবার আসলে ইঁদুরটি খেল। চতুর্থবার চাবিতে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইঁদুরটি খাবার খেতে খাবারের চেম্বারে ঢুকলো। কারণ ইঁদুরটি ইতোমধ্যে বুঝে গেল যে চাবিতে চাপ দেওয়ার সাথে খাবার পাওয়ার একটি সম্পর্ক রয়েছে। এরপর ইঁদুরটি খুব ঘন ঘন চাবিতে চাপ দিতে লাগলো। এখানে ইঁদুরটি চাবি চাপ দেওয়া ও খাবার পাওয়ার সাথে সংযোগ স্থাপন করে খাবার খেতে শিখলো।

করণ সাপেক্ষণের তিনটি মূল উপাদান:

ক) করণ আচরণ (Operant Behavior): ইচ্ছাকৃত আচরণ (যেমন: হাত তোলা, হোমওয়ার্ক করা)

খ) বলবর্ধন (Reinforcement): আচরণ শক্তিশালী করার পদ্ধতি

গ) শাস্তি (Punishment): আচরণ দুর্বল করার পরিণতি

ক) করণ আচরণ (Operant Behavior)

যে আচরণ মানুষ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় করে, এবং যার পরে পুরস্কার বা শাস্তি পেলে সেই আচরণ বাড়ে বা কমে তা-ই করণ আচরণ। ব্যক্তি পরিবেশে কাজ (operate) করে এবং সেই কাজের পরিণতির মাধ্যমে আচরণ শিখে। অর্থাৎ আচরণটি পরিবেশে কোনো প্রভাব ফেলে এবং সেই প্রভাব আচরণকে গঠন করে। এটি স্বয়ংক্রিয় নয়, বরং শিখন পরবর্তী আচরণ, যা দৈনন্দিন জীবনে সিদ্ধান্ত নিয়ে করা হয়। যেমন:

১। শিক্ষক প্রশ্ন করলে একজন শিক্ষার্থী হাত তোলে

লক্ষ্য: উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাওয়া ⟶ পরিণতি: শিক্ষক প্রশংসা করেন (পুরস্কার) ⟶ ভবিষ্যতে আরও হাত তুলবে

২। শিক্ষার্থী হোমওয়ার্ক করে

লক্ষ্য: ভালো নম্বর/শিক্ষকের প্রশংসা ⟶ পরিণতি: স্টিকার বা প্রশংসা ⟶ আচরণ পুনরাবৃত্তি হয়

৩। বাচ্চা কাঁদে যাতে মা খাবার দেয়

খাবার পেয়ে গেলে ⟶ কান্নার এই আচরণ শক্তিশালী হয়

খ) বলবর্ধন (Reinforcement)

বলবর্ধন আচরণকে জোরদার করে। আচরণকে শক্তিশালী করার জন্য যেকোনো উদ্দীপনা ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি দুই ধরনেরঃ

১. ইতিবাচক বলবর্ধন (Positive Reinforcement)

কাঙ্ক্ষিত আচরণের পর পছন্দনীয় কিছু দেওয়া। যেমনঃ স্টিকার, সার্টিফিকেট, প্রশংসা, অতিরিক্ত খেলার সময়।
২. নেতিবাচক বলবর্ধন (Negative Reinforcement)
কাঙ্ক্ষিত আচরণের পরে অপ্রীতিকর কিছু সরিয়ে নেওয়া। যেমনঃ সিটবেল্ট বাঁধলে গাড়ির অ্যালার্ম বন্ধ, হোমওয়ার্ক করলে অতিরিক্ত কাজ বাতিল। নেতিবাচক বলবর্ধন শাস্তি নয়; এটি আচরণ বৃদ্ধি করে।

বলবর্ধন এর অনুসূচি

১. অবিরাম বলবর্ধন: প্রতিটি সঠিক আচরণের পর পুরস্কার দেয়া। এটি নতুন আচরণ শেখাতে কার্যকর। যেমনঃ প্রতিবার সঠিক উত্তর দিলে স্টিকার, প্রতিবার গণিতের সমস্যা ঠিক হলে তারকা দেওয়া।
২. আংশিক বলবর্ধন: মাঝে মাঝে বলবর্ধন দেওয়া। এটি আচরণকে দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখতে কার্যকর।

গ) শাস্তি

আচরণ দুর্বল বা দমন করতে শাস্তি ব্যবহার করা হয়।
শাস্তি দুই ধরনের:
১. ঋনাত্মক শাস্তি
অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের পর অপ্রীতিকর কিছু যোগ করা। যেমন: ক্লাসে খারাপ আচরণ করলে দাঁড় করানো।
২. ধনাত্মক শাস্তি
অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের পর পছন্দনীয় কিছু সরিয়ে নেওয়া। যেমন: পকেটমানি বন্ধ, খেলাধুলার সময় কমানো প্রভৃতি।
শাস্তি আচরণ কমাতে পারে, তবে এটি ভয়, উদ্বেগ, বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে। তাই সতর্ক ব্যবহার প্রয়োজন।

শিক্ষায় স্কিনারের তত্ত্বের প্রয়োগ

১. আচরণের গঠন পরিবর্তন
ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত আচরণের দিকে নিয়ে যাওয়া। যেমন: হোমওয়ার্ক করতে না পারলে প্রথমে বই খুললে প্রশংসা করা, তারপর প্রথম লাইন লিখলে পুরস্কার পয়েন্ট দেয়া এবং পুরো কাজ শেষ করলে স্টিকার চার্ট দেয়া। এছাড়া সময়মতো কাজ জমা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা।
২. টোকেন ইকোনমি
শেণিকক্ষের নিয়ম মেনে চলতে উৎসাহ দেওয়া এবং শ্রেণির পাঠগুলোতে সক্রিয় অংশগ্রহণসহ ভালো আচরণের জন্য টোকেন দেওয়া দেয়া যেতে পারে। টোকেন জমে গেলে আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থার মাধ্যমে আচরণ গঠন করা যেতে পারে।
৩. ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট
নিয়ম ভাঙলে স্পষ্ট পরিণতি এবইং নিয়ম মানলে তাৎক্ষণিক প্রশংসা করা। সময়মতো উপস্থিতির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা। আবার খারাপ আচরণের ক্ষেত্রে পরিষ্কার নিয়ম ও পরিণতি রাখা।
৪. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে করণ সাপেক্ষণ বিশেষভাবে কার্যকর। যেমন: Autism Spectrum Disorder (ASD) শিশুদের আচরণ গঠন।

থর্নডাইক (Thorndike) এর শিখন তত্ত্ব

এডওয়ার্ড এল. থর্নডাইক (১৮৭৪-১৯৪৯) ছিলেন একজন মার্কিন শিক্ষামনোবিজ্ঞানী এবং আচরণবাদী শিখন তত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে প্রাণী (বিশেষ করে বিড়াল) নিয়ে শিখনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রচেষ্টা ও ভুল মতবাদ (Trial and Error Learning) এবং সংযোগবাদ (Connectionism) তার তত্ত্বের মূল ভিত্তি।

থর্নডাইকের পরীক্ষণ

থর্নডাইক পরীক্ষণের শুরুতে একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে রেখে একটুকরা মাছ খাঁচার বাইরে এমনভাবে রাখেন যাতে বিড়ালটা মাছটি দেখতে পায়। মাছটি এমন দূরত্বে রাখা ছিল যে, বিড়ালটি খাঁচা খুলে বাইরে আসলেই মাছটি পাবে। খাঁচার দরজাটা একটি ছিটকিনি দিয়ে এমনভাবে আটকানো ছিল যে অল্প চাপ লাগলেই ছিটকিনিটা খুলে যাবে। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি প্রথমে খাঁচার ভিতর থেকে মাছটা পাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। বিড়ালটি কখনো খাঁচার মধ্যে ছুটোছুটি, কখনো আঁচড়াতে লাগলো, আবার কখনো কামড়াতে লাগলো।

বিড়ালের খাঁচা

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ও এলোমেলো ভাবে চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ছিটকিনির উপর বিড়ালটির পা লেগে দরজাটি খুলে যায়। বিড়ালটি বাইরে এসে ঐ খাবার খেল। বিড়ালটিকে আবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাঁচার মধ্যে রাখা হলে বিড়ালটি একইভাবে এলোমেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ খাঁচার দরজা খুলে খাবারের কাছে পৌঁছাতে সমর্থ হলো। বিড়ালটি প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিন কম ভুল করলো ও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে খাঁচা থেকে বেড়িয়ে এলো। তৃতীয় দিনে তার প্রচেষ্টার সংখ্যা আরও কমে এলো এবং পূর্ব দিনের তুলনায় সময় আরও কম লাগল। এইভাবে পরীক্ষণ কাজটা চালিয়ে দেখা গেল যে, এক সময় বিড়ালটির ভুলের সংখ্যা কমে আসছে এবং সময় কম লাগছে। শেষকালে একদিন দেখা গেল বিড়ালটি আর একটাও ভুল প্রচেষ্টা করছে না। যখনই বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপক (ছিটকিনির উপর চাপ) ও প্রতিক্রিয়ার (খাবার খাওয়া) মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হল, তখনই তার ছিটকিনি খোলার শিখন সমাপ্ত হলো।

থর্নডাইকের শিখনের সূত্র

থর্নডাইক মোট তিনটি প্রধান সূত্র এবং কয়েকটি গৌণ সূত্র দিয়েছেন।
প্রধান তিনটি সূত্র হলোঃ

১) প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)

শিখনের জন্য মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি থাকা জরুরি। প্রস্তুত অবস্থায় শেখানো সহজ ও আনন্দদায়ক হয়। অপ্রস্তুত অবস্থায় শেখাতে গেলে অস্বস্তি তৈরি হয়।

২) অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise)

শিখনের জন্য অনুশীলন আবশ্যক। অনুশীলনের সূত্রের দুটি অংশ রয়েছে: কোন প্রতিক্রিয়া যত বেশি ব্যবহৃত হয়, তার সংযোগ তত শক্তিশালী হয়। ব্যবহার না করলে সংযোগ দুর্বল হয় বা হারিয়ে যায়।

৩) ফল লাভের সূত্র (Law of Effect)

কোনো আচরণের পর যদি সুখকর ফল আসে, তাহলে সেই আচরণ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বাড়ে। অপ্রীতিকর ফল হলে আচরণটি কমে যায় বা বন্ধ হয়।

আনুষঙ্গিক অপ্রধান সূত্রসমূহ

থর্নডাইক আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক সূত্র দেন যেগুলো নতুন কিছু আয়ত্ত করতে সহায়তা করে। এগুলো হলো:

ক) বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple Response): বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা হয় যতক্ষণ না সঠিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।

খ) মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of Mental State): ব্যক্তির মানসিক অবস্থা তার শিখনকে প্রভাবিত করে।

গ) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Partial Response): সমস্যার একটি অংশ নিয়ে কাজ করলে পুরো সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হয়।

ঘ) আত্তীকরণের সূত্র (Law of Assimilation): পূর্বের অভিজ্ঞতার সাথে মিল খুঁজে শেখা।

ঙ) অনুষঙ্গামূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative Shifting): এক সংযোগ থেকে অন্য সংযোগে পরিবর্তন ঘটতে পারে।

প্রচেষ্টা ও ভুল (Trial and Error) মতবাদ

থর্নডাইকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারণা হচ্ছে প্রচেষ্টা ও ভুল মতবাদ। শিক্ষার্থী বা প্রাণী বিভিন্ন চেষ্টা (trial) করে এবং ভুল করে যতক্ষণ না সঠিক সমাধান পায়। যেমন: থর্নডাইকের "Puzzle Box" পরীক্ষায় বিড়াল অনেকবার চেষ্টা করে ভুল করতে করতে অবশেষে দড়ি টেনে দরজা খুলে বের হতে শেখে।

শ্রেণিকক্ষে প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতির প্রয়োগ

থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল মতবাদ (Trial and Error Theory) শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ ও প্রাণী উভয়ই বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করতে করতে ভুল সংশোধনের মাধ্যমে সঠিক আচরণে পৌঁছে যায়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কোনো সমস্যা সমাধানের সময় প্রথমে বিভিন্ন প্রচেষ্টা করে এবং ভুলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সঠিক সমাধান শিখে নেয়। তবে শিখন অন্ধ প্রচেষ্টায় নয়; যৌক্তিক চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও নির্দেশনার সমন্বয়ে হওয়া প্রয়োজন।

থর্নডাইকের মতবাদের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট তাৎপর্য

১. শিখনের জন্য শিক্ষার্থীকে সমস্যার গুরুত্ব বুঝে সচেতন প্রচেষ্টা করতে হবে; শিক্ষককে উৎসাহ দিতে হবে।

২. নতুন বিষয় শেখানোর সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর ওপর শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিতে সাহায্য করতে হবে।

৩. নতুন জ্ঞানকে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে শিখন অর্থপূর্ণ হয়।

৪. শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন প্রচেষ্টার পার্থক্য বুঝে সঠিক প্রতিক্রিয়া বেছে নিতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীর স্বাধীন প্রচেষ্টা প্রয়োজন; বিভিন্ন সমাধান তুলনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে শিক্ষককে দিকনির্দেশনা দিতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা

১) সমস্যা সমাধানমূলক কার্যক্রম: শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে সমস্যা দেওয়া যাতে তারা বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করে সঠিক সমাধানে পৌঁছায়।

২) শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ: শিক্ষার্থীরা বারবার চেষ্টা ও চর্চার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে (যেমন: গণিত অনুশীলন, বানান লেখা)।

৩) পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন: অনুশীলনের সূত্র অনুযায়ীযী ধারাবাহিক অনুশীলন শিখনকে শক্তিশালী করে।

৪) তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Immediate Feedback): সফল উত্তরে উৎসাহ এবং ভুল উত্তরে সংশোধনী প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী হয়।

৫) ড্রিল ও প্রাকটিস কার্যক্রম: ভাষা শেখা (শব্দ, বানান, ব্যাকরণ), গণিতে গুণন টেবিল, কম্পিউটার দক্ষতায় পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ।

ব্রুনার (J. Bruner) এর নব্য জ্ঞানবাদ

জেরম ব্রুনার ছিলেন একজন প্রখ্যাত জ্ঞানমনোবিজ্ঞানী। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিখন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষার্থী নিজেই জ্ঞান গঠন করে (construct knowledge)। শিক্ষা শুধু তথ্য মুখস্থ করার বিষয় নয়; বরং শিক্ষার্থী নিজেদের অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে জ্ঞান গড়ে তোলে। ব্রুনার শিক্ষাকে দেখেছেন একটি আবিষ্কারের মাধ্যমে শিখন (উদ্ভাবনীমূলক শিখন) প্রক্রিয়া হিসেবে, যেখানে শিক্ষক পথপ্রদর্শক, আর শিক্ষার্থী সক্রিয় অনুসন্ধানকারী।

ব্রুনারের জ্ঞান বিকাশের স্তর

ব্রুনার মানুষের জ্ঞান বিকাশকে তিনটি ভিন্ন উপস্থাপন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলো শিশুর বয়স বাড়ার সাথে লিনিয়ার নয়; বরং জীবনের সব পর্যায়ে বিভিন্নভাবে কার্যকর থাকে।

১. সক্রিয় অবস্থা (Enactive Mode)

শিখন ঘটে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সক্রিয় কর্মের মাধ্যমে (hands-on experience)। শিশু বস্তু স্পর্শ করে, নেড়ে দেখে, কাজ করে শেখে। “কোনো একটা কাজ কীভাবে করা হয়”, তা ঐ কাজে সম্পৃক্ত হয়ে বোঝা যায়। যেমন: ব্লক সাজিয়ে সংখ্যা শেখা, বোতাম টিপে শব্দ বের করা ইত্যাদি।

২. চিত্ররূপ অবস্থা (Iconic Mode)

শিখন ঘটে চিত্র, ছবি, মানসিক ইমেজ, ডায়াগ্রাম এর মাধ্যমে। শিশু বাস্তব বস্তু না দেখে তার চিত্র দেখে ধারণা নেয়। যেমন: ফলের ছবি দেখে ফল চিনে নেওয়া, মানচিত্র দেখে জায়গা বুঝা।

৩. সাংকেতিক অবস্থা (Symbolic Mode)

শিখন ঘটে ভাষা, সংখ্যা, প্রতীক, শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে। বিমূর্ত চিন্তা, লজিক ও ধারণা তৈরি হয়। যেমনঃ “৫+৭=১২”, “বাংলা", “A for Apple” - এগুলো প্রতীকের মাধ্যমে ধারণা পাওয়া।

ব্রুনারের নির্দেশনা তত্ত্বের ৪টি বৈশিষ্ট্য

ব্রুনারের মতে একটি কার্যকর নির্দেশনা (Instruction) চারটি মৌলিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্যের ওপর দাঁড়িয়ে। এগুলো হলোঃ

১. জানার প্রতি অনুরাগ/আগ্রহ (Disposition to Learn)

বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে শিক্ষার্থীর কৌতূহল জাগে, শিখনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে। সেইসাথে শিখনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে।

২. জ্ঞানের কাঠামো গঠন (Structure of Knowledge)

জ্ঞানকে সুগঠিতভাবে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে জ্ঞানের মূল কাঠামো সহজে মনে থাকে। শিখনের বিষয়টি সহজ থেকে কঠিনে সাজানো যেন বিষয়কে "Scaffolding" বা ধাপে ধাপে সহায়তা দিয়ে শিখন নিশ্চিত করা যায়।

৩. নির্দেশনার ধারাবাহিক উপস্থাপন (Sequence of Instruction)

কী আগে শেখানো হবে এবং কী পরে শেখানো হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান বিকাশের স্তর (Enactive → Iconic → Symbolic) অনুসারে পাঠক্রম সাজানো। যেমন কোনো এলাকার ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিতে চাইলে প্রথমে ভূমির ধরন, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়গুলো আগে বুঝিয়ে তারপর ভূপ্রকৃতির একটি সার্বিক ধারণা দেয়া।

৪. নির্দেশনায় বলবর্ধন

শিখনকে উদ্দীপিত রাখতে শিক্ষার্থীর সঠিক উত্তর বা প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া এবং ভুল সংশোধনের জন্য তাৎক্ষণিক প্রতিফলন প্রদান শিখনকে সুসংহত করে। নির্দেশনায় বলবর্ধনের প্রতিক্রিয়া শিখনের ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

শিখন ব্যবস্থায় ব্রুনারের অবদান (Bruner's Contribution to Learning System)

১. উদ্ভাবনীমূলক শিখন (Discovery Learning): শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিখে। এটি শিক্ষাকে বাস্তব ও দীর্ঘস্থায়ী করে।

২. শঙ্খিল শিক্ষাক্রম (Spiral Curriculum) : শঙ্খিল শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে একই বিষয় সহজভাবে শুরু করে ধাপে ধাপে জটিল করা। শিক্ষার্থীরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে একই ধারণা নতুন গভীরতায় শিখে।

৩. স্ক্যাফোল্ডিং (Scaffolding) এর ব্যবহারঃ শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রথমে বেশি সহায়তা দেন এবং ধীরে ধীরে সেই সহায়তা কমিয়ে দেন। এতে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শিখতে শেখে।

৪. Active Learning প্রচলনঃ শিক্ষার্থীই শিখনের কেন্দ্র (Learner-centered)। হাতে কলমে, আলোচনা, সমস্যা সমাধান, অনুসন্ধান এসবের মাধ্যমে শিখন ঘটে।

৫. Representation System (Enactive, Iconic, Symbolic): বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে, এই তিন স্তর অনুসারে বিষয়বস্তু সাজানো হয়।

৬. কগনিটিভ সাইকোলজিকে শিখনে ব্যবহারঃ শিখনকে আচরণ নয়, বরং মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা। শিশুর চিন্তার রূপান্তর কিভাবে ঘটে তা বুঝতে সাহায্য করে।

ব্রুনারের শিক্ষা চিন্তা শিক্ষাকে করে তুলেছে অনুসন্ধানমূলক, সমস্যা সমাধানমুখী, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, ধাপে ধাপে সহায়ক এবং কগনিটিভ বিকাশ অনুযায়ী সংগঠিত। ফলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার গঠন, পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ব্রুনারের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আলবার্ট বান্দুরা (A. Bandura) এর সামাজিক জ্ঞানমূলক তত্ত্ব

আলবার্ট বান্দুরা মূলত: একজন আচরণবাদী মনোবিদ। তিনি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ মূলক শিখনের উপর গবেষণা করেন। কিন্তু সব ধরনের শিখন এই তত্ত্বটি দ্বারা ব্যখ্যা করা যায় না, তাই তিনি বিকল্প হিসেবে সামাজিক শিখনের তত্ত্ব (Social Learning Theory) প্রতিষ্ঠা করেন। এই তত্ত্বে তিনি শিখনের উপর সমাজের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাথমিক অবস্থায় বান্দুরা তার গবেষণায় ব্যক্তির শিখনের ভিত্তি হিসেবে অন্যকে দেখে শেখার প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই দেখে শেখার প্রবণতা ধীরে ধীরে ব্যক্তির চাহিদা, পছন্দ, ভালো লাগা-মন্দ লাগা প্রভৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে বান্দুরা পিঁয়াজের তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক শিখনের প্রেক্ষাপটে কীভাবে ব্যক্তির জ্ঞান সংগঠিত হয়, সে বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা দেন এবং তার সামাজিক শিখন তত্ত্বকে আধুনিকরূপ দিয়ে সামাজিক জ্ঞানমূলক তত্ত্ব (Social Cognitive Theory) প্রতিষ্ঠা করেন।

বান্দুরার সামাজিক জ্ঞানমূলক তত্ত্বটি একটি শিখনের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর মধ্যে কতগুলি জন্মগত বৈশিষ্ট্য থাকে, যা তার জীবন বিকাশের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে। তার মতে ব্যক্তির জীবন বিকাশের মূল উপাদান তিনটি - আচরণ, জ্ঞানমূলক ও ব্যক্তিগত উপাদান এবং পরিবেশ। এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ হয়। আর ব্যক্তি জীবনের বিকাশের কার্যকরী কৌশল হল পর্যবেক্ষণমূলক শিখন। শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার দরুণ সে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পরে এই অভিজ্ঞতাগুলো সুবিন্যস্ত করে আচরণ ধারায় পরিবর্তন আনে। এর ফলে শিশুর সামাজিক বিকাশ ঘটে। বান্দুরা এই সামাজিক বিকাশকে ২টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা-

১) গ্রহণের পর্যায় এবং ২) সম্পাদনের পর্যায়

১) গ্রহণের পর্যায়

গ্রহণের পর্যায়ে মনোযোগ, সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সহায়তায় জ্ঞান মূলক বিকাশ (Cognitive Development) হয় আর সম্পাদনের পর্যায়ে পুনুরুখান ও প্রেষণামূলক প্রক্রিয়ায় আচরণগত বিকাশ (Behavioral Development) ঘটে। আর এই বিকাশ ব্যক্তির সমাজ ও পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজের কাছ থেকে ব্যক্তির এই শিখন সংগঠনের প্রক্রিয়ায় বান্দুরা ২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন -একটি হল অনুকরন (Modeling) এবং অপরটি হল বলবর্ধন (Reinforcement)।

মডেলিং (Modeling)

মডেলিং হল অন্যের বিশেষ কোন আচরণ অনুকরণ করা। বান্দুরার মতে বেশিরভাগ শিখন হয় মডেলিং থেকে, অর্থাৎ শিখন হচ্ছে অপরের আচরণ পর্যবেক্ষণের ফল। মডেলিং দেখে তা অনুকরণ করে শিশু শেখে। এই অনুকরণ সবসময় জেনে বুঝে নাও হতে পারে, অবচেতনভাবেও এক জনের আচরণ দেখে অন্যজন আচরণ করতে শেখে। আবার সচেতনভাবেও বড়রা বা শিক্ষকরা অনুকরণের বিষয়টি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। নিচের ধারাটিকে মডেলিং এর জন্য কার্যকর ধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয় -

১. Attention Gaining Process: বাবা-মায়েরা শিশুদের সারা জীবন ধরে পর্যবেক্ষণমূলক শিখন বা মডেলিং-এর প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দিয়ে থাকে। মডেলিং সর্বদা মনোযোগের দাবি রাখে। কেননা ব্যক্তি বা শিশু যে আচরণগুলো করে তার বেশীরভাগই তার মনোযোগ সহাকারে পর্যবেক্ষণের ফল। যদি কোন আচরণ মনোযোগ সহকারে না দেখে, তাহলে সেই

আচরণ তার মাঝে কোন প্রভাব ফেলে না ফলে তা সে নিজের আচরণ হিসেবে আয়ত্বও করতে পারে না। একইভাবে মডেলিং-এর কতগুলো গুণ থাকা দরকার; যেমনঃ মডেলিং সবসময় আকর্ষনীয়, বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, ব্যক্তির জন্য উপযোগি হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার মডেলিং-এর বিষয়বস্তু খুব কঠিন বা খুব সহজ হবে না এবং এর যথেষ্ট মূল্যমান থাকাও জরুরী। যেমনঃ কার্টুন এবং বিভিন্ন শিশুতোষ অনুষ্ঠানসমূহ শিশুদের জন্য অনেক আকর্ষণীয় হলেও সবসময় তা মান সম্পন্ন হয় না।

২. Retention Process: বান্দুরা একে মডেলিং-এর দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কেননা এই ধাপে শিশু তার পর্যবেক্ষণ করা আচরণটি সংরক্ষণ করে। এজন্য শিশু বা ব্যক্তির সামনে যে আচরণ মডেলিং করা হয়, তা অবশ্যই স্মরণযোগ্য, অর্থবহ, স্পষ্ট, বিস্তারিত এবং ধারাবাহিক হওয়া প্রয়োজন, কেননা আচরণটি অনুকরণ করতে চাইলে যেন তা বাস্তবিকভাবে কিংবা মানসিকভাবে চর্চা করা যায়, তা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। কেননা যে আচরণটি শিশুর সামনে অনেক আকর্ষণীয় বা উদ্দীপনাময়ভাবে উপস্থাপিত হয় তা অনেক বেশী মনে থাকে এবং পরে তা স্মরণ করে প্রয়োগ করা সহজ হয়।

৩. Motor Reproduction Process: যে আচরণ শিশু অনুকরণ করে উপস্থাপন বা প্রয়োগ করে তাই পুনুরুখান বা Motor Reproduction, যেমন: শিশু নিজে নিজে জুতার ফিতা বাঁধতে চেষ্টা করে। আচরণ পুনুরুখান শিশুকে বা ব্যক্তিকে হাতে কলমে কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই ধাপে শিশু বা ব্যক্তি তার স্নায়ু ও মাংসপেশী ব্যবহার করে আচরণকে বার বার চর্চা করতে পারে, অন্যের মতামত নিয়ে তা পরিশুদ্ধ করার সুযোগ পায়। যেমন: গলফ খেলা, পিংপং বল খেলা, সাঁতার কাটা, নৃত্য করা।

৪. Motivational Processes: কোন আচরণ শিশু বা ব্যক্তি প্রয়োগ করবে তা নির্ধারণ করে শিশু বা ব্যক্তির প্রেষণা। তাই যে আচরণটি মডেলিং করা হবে তা যেন শিশুর অনুকরণের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার যেমন, আমরা মনে করি একজন শিক্ষকের মুখের প্রশংসা ছাত্রের জন্য এক ধরনের প্রেষণা (Motivation)। অপর দিকে একজন বড় ছাত্রের জন্য শিক্ষকের এই ধরনের প্রশংসা পরবর্তিতে তাকে বন্ধুদের তিরস্কারের মুখে ফেলে দেয়। ফলে ঐ ছাত্র সেই আচরণ আর কখনও করবে না। সঠিক সময়ে এবং সঠিক ক্ষেত্রে যদি প্রশংসা করা যায়, তবে সেই আচরণ শিশুর মাঝে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। যেমন: সহপাঠীদের প্রশংসা, সম্মান, বাবা-মায়ের উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা, সাফল্যের তৃপ্তি, সামাজিক গুরুত্ব ইত্যাদি।

বলবর্ধন

বলবর্ধন হল এমন কিছু কর্মকান্ড, যা ব্যক্তিকে কোন আচরণ করতে বা না করতে উৎসাহিত করে। এটি অন্যের আচরণ অনুকরণ করতে উৎসাহিত করে, ফলে শিখন হয় (বিশেষ ব্যক্তিত্বদের; যেমন: বাবা-মা, শিক্ষক, তারকাদের আচরণ জীবনে প্রভাব ফেলে)। বান্দুরা এবং তার সহযোগীরা ৩ ধরনের বলবর্ধন এর কথা বলেছেন, যা শিখনকে এগিয়ে নিতে এবং নতুন আচরণকে ধরে রাখতে সহায়তা করে।

১.বাহ্যিক বলবর্ধন (External Reinforcement): এই ধরনের পুরস্কারে মূলত ব্যক্তির ইতিবাচক গুণের প্রশংসা করা হয়, ফলে তার মাঝে সেই আচরণটি করার উৎসাহ বাড়ে এবং তা স্থায়ী হয়।

২.পর্যবেক্ষণজনিত বলবর্ধন (Vicarious Reinforcement): কারও ইতিবাচক বা নেতিবাচক আচরণ এবং তার ফলাফল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি সেই আচরণ অনুশীলন করতে বা আচরণটি না করতে উৎসাহিত হয়, এটাই পর্যবেক্ষণজনিত বলবর্ধন।

৩.স্বতঃস্ফূর্ত বলবর্ধন (Self-reinforcement): নিজের কাজের বা আচরণের সমালোচনা করার মধ্য দিয়ে কেউ কেউ সেই আচরণটি করার জন্য বা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, তাই Self-reinforcement। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমালোচনা বাড়াবাড়ি রকমের হলে তা ব্যক্তির কর্মস্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়।

২) সম্পাদনের পর্যায়

সম্পাদনের পর্যায় হলো পর্যবেক্ষণ করে শিখে নেওয়া আচরণ বাস্তবে প্রয়োগ করার ধাপ। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী বা শিশু কেবল দেখে শিখে থাকে না; বরং শেখা আচরণটি বাস্তবে করে দেখায়। সম্পাদনের পর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ

১। বাস্তব প্রয়োগ

শেখা আচরণ বাস্তব পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়।

যেমনঃ বন্ধুকে দেখে জুতার ফিতা বাঁধা শিখেছে ⟶ এখন নিজে ফিতা বাঁধার চেষ্টা করছে।

২। মোটিভেশন বা প্রেষণা প্রয়োজন

পুরস্কার, প্রশংসা, সফল অভিজ্ঞতা প্রভৃতি আচরণ প্রয়োগে উৎসাহ দেয়।

৩। পরীক্ষা ও সমন্বয়

প্রথমবার আচরণটি সঠিক নাও হতে পারে; তাই চেষ্টা করতে করতে সঠিক রূপ নিরূপন করতে পারে।

৪। ফলাফল দেখা ও পুনর্ব্যবহার

আচরণ কার্যকর হলে পুনর্ব্যবহার তৈরি হয়, অকার্যকর হলে আচরণ পরিবর্তন হয়।

সম্পাদনের পর্যায়ের ধাপসমূহ

১. শেখা আচরণ স্মরণ করা: পর্যবেক্ষণ করে মনে রাখা কৌশলগুলো মনে পড়ে।

২. পরিস্থিতি বোঝা: কখন, কীভাবে আচরণটি প্রয়োগ করতে হবে তা যাচাই করে।

৩. আচরণ করে দেখা: শেখা কৌশল প্রয়োগ করে বাস্তবে কাজ করা।

৪. ফলাফল বিশ্লেষণ: সফল হলো কি না তা বোঝা।

৫. আচরণে পরিবর্তন আনা: ভুল হলে সংশোধন, সফল হলে স্থায়ী করা।

সম্পাদনের পর্যায়ের গুরুত্ব

- শুধুমাত্র দেখা বা শোনা দিয়ে শেখা সম্পূর্ণ হয় না, বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন স্থায়ী হয়।
- ভুল ও সঠিকের অভিজ্ঞতা জ্ঞানকে দৃঢ় করে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা গড়ে ওঠে।

শ্রেণিকক্ষে সম্পাদনের পর্যায়ের প্রয়োগ

১. মডেলিং দেখানো: শিক্ষক আগে কাজটি করে দেখান (যেমনঃ গ্রাফ আঁকা, শব্দ বিভাজন, গণিত সমস্যা)।

২. শিক্ষার্থীর চেষ্টা: শেখা কৌশল নিজে প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া।

৩. তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া: সঠিক হলে প্রশংসা, ভুল হলে সংশোধনমূলক নির্দেশনা দেওয়া।

৪. পুনরাবৃত্তির সুযোগ: পুনর্বার প্রয়োগ করতে দিলে শিখন স্থায়ী হয়।

৫. ভয় বা লজ্জা দূরীকরণ: “ভুল করলে কিছু হবে না”—এই বিশ্বাস তৈরি করা।

শিক্ষক নিম্নে উল্লিখিত উদাহরণসমূহ শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করতে পারেনঃ
বিষয়বস্তু: পড়া শেখা

- গ্রহণঃ: শিক্ষক শব্দ উচ্চারণ করে শোনালেন
- সম্পাদন: শিক্ষার্থী নিজে শব্দ উচ্চারণ করে পড়ার চেষ্টা করছে

বিষয়বস্তু: গণিত

- গ্রহণ: শিক্ষক ভাগ করার নিয়ম দেখালেন
- সম্পাদন: শিক্ষার্থী নিজে ভাগ করতে বসলো

বিষয়বস্তু: সামাজিক আচরণ

- গ্রহণ: শিশু দেখে বন্ধুরা লাইনে দাঁড়াচ্ছে
- সম্পাদন: সে নিজেও লাইনে দাঁড়ায়

শিক্ষাক্ষেত্রে বান্দুরার সামাজিক জ্ঞানমূলক তত্ত্বের অবদান

শিশুর সামাজিক শিখন শুরু হয় তার শিক্ষকের বিভিন্ন আচরণ দেখে। শিক্ষকের মডেলিং শিশুকে তার বিভিন্ন কর্মকান্ডে এবং পরবর্তী জীবনেও বিভিন্ন আচরণ করেত সহায়তা করে। যেমন: একে অন্যের সাথে সহযোগীতার ভিত্তিতে কাজ করা, ভালো কাজে অন্যের প্রশংসা করা ইত্যাদি। শিক্ষাক্ষেত্রে মডেলিংকে কার্যকর করতে চাইলে নিচের কয়েকটি বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন:

১) মনোযোগ আকর্ষণ করা,

২) বিষয়কে স্মরণযোগ্য করা,

৩) অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করা,

৪) যথাযথ প্রণোদনা দেয়া।

বান্দুরার মতে শিখনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য শিক্ষক নিচের কাজগুলো করতে পারেন:

১) কাজটি করতে শিশুকে সরাসরি সহায়তা করতে পারেন।

২) বিষয় উপযোগী বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন (আচরণটি ধাপে ধাপে মডেলিং করা)।

৩) উৎসাহ, প্রশংসা ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন।

৪) ভুলকে স্বাভাবিক শিখন প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণের মানসিকতা তৈরির জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় প্রতিক্রিয়াকে উদ্দীপিত করতে পারেন।

৫) নিরাপদ ও চাপমুক্ত শিখন পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষার্থীকে বারবার অনুশীলনের সুযোগ করে দিবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ শিক্ষা শুধু জ্ঞান প্রদান নয়, এটি মানব আচরণ, চিন্তা, আবেগ ও বিকাশের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সমন্বিত রূপই হলো শিক্ষামনোবিজ্ঞান, যা মানুষের শিখনপ্রক্রিয়া বোঝা এবং তা উন্নত করার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করে। এটি মানুষের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া বোঝার মাধ্যমে কার্যকর শিখন-শেখানোকে সহজ করে। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষাসামগ্রী প্রস্তুতি, শিখন পরিমাপ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষা পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, এবং বিশেষ শিক্ষার উন্নয়ন - এসব ক্ষেত্রেও এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। শিক্ষাকে কার্যকর, অর্থপূর্ণ ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক করতে মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী(রেফারেন্স)

1. Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory.* New York: General Learning Press.
2. Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thoughts and Action.* Englewood Cliffs, NJ: Printice Hall.
3. Behlol, Malik Golam and Hukam Dad (2010). *Concept of learning.* International Journal of Psychological Studies; 2:2.
4. Bruner, J. S. (1960). *The Process of Education.* Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. Bruner, J. S. (1966). *Towards a Theory of Instruction*. Massachusetts: Harvard University Press.
6. Crain, William C (1992). *Theories of Development: Concepts and Applications*. N.J. Prentice Hall.
7. Crow, L.D. and Crow, A. (1973). *Educational Psychology.* New Delhi: Eurasia Publishing House.
8. Erikson, E. and Erikson, J. M. (1998). *The Life-Cycle Completed (Extended version ed.)*. Norton and Company.
9. Flavell. J.H. (1985). *Cognitive Development (2nd ed.)* NJ.: Printice Hall.
10. Inhelder, B. & Piaget, J. (1958). *The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence.* New York: Basic Books.
11. Murphy, Garnder (1968). *An Introduction to Psychology.* New Delhi: Oxford & IBH.
12. Nicky Hayes (2003). *Applied Psychology (Teach Yourself Series).* New York, McGraw-Hill.
13. Piaget, J., & Cook, M. T. (1952). *The origins of intelligence in children*. New York, NY: International University Press.
14. Skinner, B. F. (1938). *The behavior of organisms: An experimental analysis.* New York: Appleton-Century.
15. Skinner, B. F. (1968). *The technology of teaching.* New York: Appleton-Century-Crofts.

16. Thorndike, E. L., Bregman, E. O., Tilton, J. W., & Woodyard, E. (1928). *Adult Learning.* New York: Macmillan.
17. Woodworth, R.S. (1945). *Psychology.* London: Methuen.
18. Woolfolk, A. (2006). *Educational Psychology (13th edition).* Boston: Pearson.
১৯. খালেক, ড: আবদুল ও হক, মু. নাজমুল (১৯৯৬), আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, ঢাকা, হাসান বুক হাউজ।
২০. হক, মু. নাজমুল ও জাহান, মনিরা (১৯৯৯), শিশুর জ্ঞান বিকাশের ধারা: পিঁয়াজে তত্ত্ব, ঢাকা, বংলা একাডেমী।
২১. হক মু. নাজমুল ও হোসেন, সায়রা (২০১৫), শিক্ষায় জ্ঞান বিকাশ তত্ত্ব, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন।
২২. হক, মু. নাজমুল, হোসেন, সায়রা ও হাবীব, মোঃ আহসান (২০১৮), শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন।

অধ্যায় ৪: মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশ

মানব মস্তিষ্ক হলো দেহের সবচেয়ে জটিল, গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় অঙ্গ। আমাদের আচরণ, অনুভূতি, চিন্তা, শেখা, স্মৃতি, ভাষা - সবকিছুই মস্তিষ্কের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হয়। মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্কতা পর্যন্ত মস্তিষ্ক ক্রমাগত বিকাশ লাভ করে। প্রতিটি নতুন অভিজ্ঞতা, শেখার সুযোগ, সামাজিক সম্পর্ক, খেলাধুলা, পুষ্টি ও পরিবেশগত উদ্দীপনা মস্তিষ্কে নতুন সংযোগ তৈরি করে এবং শিখনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাই মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি - কারণ শিক্ষার্থীর আচরণ, মনোযোগ, শেখার সমস্যা বা উন্নতি - এসবের মূল ভিত্তি এই মস্তিষ্ক। এই অধ্যায়ে আমরা মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, তাদের কাজ, এবং বিকাশে প্রভাবক উপাদানগুলো এবং একজন অভিভাবক হিসেবে বাড়িতে ও শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে কি ভুমিকা রাখতে পারে তা সহজ ভাষায় আলোচনা করব।

মস্তিষ্কের গঠন ও কাজ

মস্তিষ্ক হলো আমাদের দেহের সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটি গোটা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে - আমরা কী ভাবি, কী শিখি, কী অনুভব করি, কীভাবে কথা বলি, কীভাবে চলাফেরা করি - সবই মস্তিষ্কের নির্দেশে হয়। মস্তিষ্ক মাথার খুলি বা করোটির ভেতরে থাকে। এটি নরম টিস্যু দিয়ে তৈরি এবং তিনটি শক্ত ঝিল্লির আবরণ দিয়ে সুরক্ষিত থাকে। এছাড়া সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড নামক তরল মস্তিষ্ককে ঝাঁকুনি থেকে রক্ষা করে। মস্তিষ্কের কোষগুলিকে নিউরন বা স্নায়ুকোষ। মস্তিষ্ক কাজ করে লক্ষ লক্ষ নিউরন বা স্নায়ুকোষের মাধ্যমে।

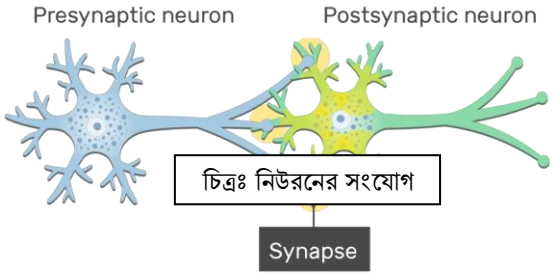

চিত্রঃ নিউরনের সংযোগ

মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান অংশ: সেরিব্রাম, সেরিবেলাম এবং ব্রেইনস্ট্রেম।

১. **সেরিব্রাম (Cerebrum):** সেরিব্রামের দুটো দিক-ডান দিক ও বাম দিক।

- ◆ বাম দিক ভাষা, গণিত, যুক্তি এসব কাজে বেশি সক্রিয়।
- ◆ ডান দিক সৃজনশীলতা, ছবি বোঝা, সংগীত, কল্পনা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক।

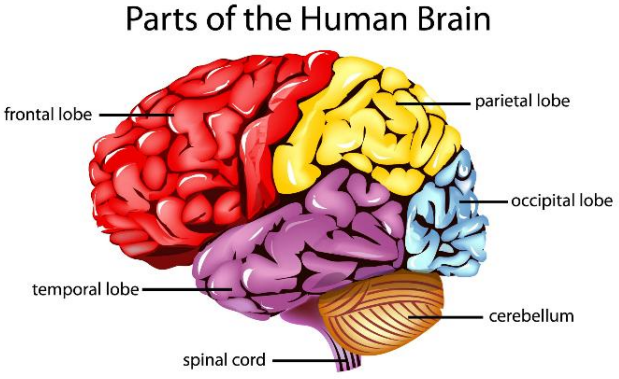

সেরিব্রাম কে আবার চারটি লোব বা অংশে ভাগ করা:

ফ্রন্টাল লোব

- ➢ চিন্তা করা, পরিকল্পনা করা,সিদ্ধান্ত নেওয়া, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, আচরণ এবং মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ, শিশুদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ, আচরণগত শৃঙ্খলা ও সমস্যা সমাধান - সবই মূলত এই অংশের কাজ। শিশু ক্লাসে হাত তুলে কথা বলা, পরীক্ষায় প্রশ্ন দেখে কীভাবে উত্তর দেবে তা ফ্রন্টাল লোব নিয়ন্ত্রণ করে।

প্যারাইটাল লোব

- ➢ স্পর্শ, তাপ, ব্যথা বোঝা, শরীরের অবস্থান বোঝা, এমনকি অংক শিখনের সঙ্গেও এই অংশ জড়িত। যেমন: শিশু গরম কাপ ছুঁয়ে হাত সরিয়ে নেয়, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা সংখ্যা বুঝতে পারে।

টেমপোরাল লোব

- শোনার ক্ষমতা, ভাষা বোঝা ও শিখন, স্মৃতি সংরক্ষণ, গল্প মনে রাখা - এসবের সাথে এর গভীর সম্পর্ক। ফলে শিক্ষক যা বলেন, তা বুঝতে পারে আবার কবিতা মুখস্থ রাখতে পারে।

অক্সিপিটাল লোব

- চোখে দেখা তথ্য প্রক্রিয়াজাত করতে, ছবি, রং, আকৃতি চিনতে সাহায্য করে। যেমন: এর মাধ্যমে আকার, রং, ছবি চিনতে পারে; চার্ট বা মানচিত্র বুঝতে পারে।

২. সেরিবেলাম (Cerebellum)

সেরিবেলাম হলো মানব মস্তিষ্কের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সেরিব্রামের নিচে এবং ব্রেইনস্টেমের পেছনে অবস্থিত। এর আকার তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও এটি শরীরের নড়াচড়া, ভারসাম্য, সমন্বয় এবং সূক্ষ্ম মোটর দক্ষতা নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রাখে। সেরিবেলামকে অনেক সময় "Little Brain" বা "ছোট মস্তিষ্ক" বলা হয়, কারণ এর নিজস্ব গঠন, ভাঁজ এবং কার্যপ্রণালী সেরিব্রামের মতো হলেও এটি অপেক্ষাকৃত ছোট।

সেরিবেলামের প্রধান কাজ

শরীরের ভারসাম্য রক্ষা: সেরিবেলাম আমাদের দাঁড়ানো, হাঁটা, দৌড়ানো বা বসে থাকার সময় শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে সাহায্য করে। যেমন: চোখ বন্ধ করে এক পায়ে দাঁড়ানো, বাঁকে দৌড়ানো ইত্যাদি। এসব কাজ সেরিবেলাম ছাড়া সম্ভব নয়।

নড়াচড়া ও সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ: শরীরের বিভিন্ন অংশ একসাথে ও সঠিক কৌশলে নাড়াতে সেরিবেলাম সাহায্য করে। যেমন: হাত-চোখের সমন্বয় (যেমন বল ধরা, আঁকা, লিখা), খেলাধুলার নড়াচড়া (যেমন ব্যাট ঘোরানো, ফুটবল কিক করা)।

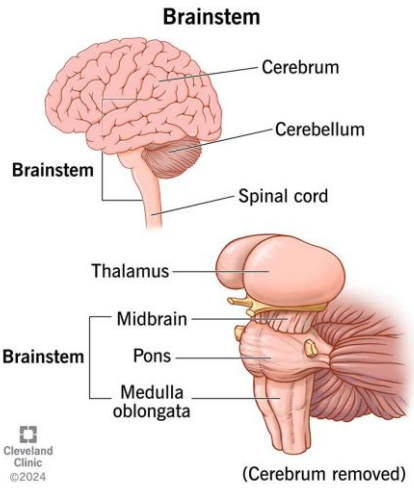

সূক্ষ্ম পেশীজ দক্ষতা উন্নয়ন: খুব ছোট ও নিখুঁত নড়াচড়া যেমন: পেন্সিল ধরা, জামার বোতাম লাগানো, ছোট জিনিস তোলা - এসব কাজকে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে সেরিবেলাম কাজ করে।

মোটর স্মৃতির মাধ্যমে শিখন: সেরিবেলাম নতুন নড়াচড়া শেখা এবং বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। যেমন:সাইকেল চালানো শেখা, সাঁতার শেখা, লেখা শেখা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো প্রভৃতি দক্ষতাগুলো একবার শিখে গেলে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে, যা সেরিবেলামের "মোটর স্মৃতি"র কারণে হয়।

৩. ব্রেইনস্টেম (Brainstem)

ব্রেইনস্টেম হলো মস্তিষ্কের সবচেয়ে পুরোনো ও মৌলিক অংশ, যা মস্তিষ্ককে মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে। এটি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বয়ংক্রিয় কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। যেমনঃ শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ, ঘুম-জাগরণ ইত্যাদি।

ব্রেইনস্টেমের প্রধান তিনটি অংশ

মেডুলা অবলংগাটা: এটি ব্রেইনস্টেমের নিচের অংশ।

পন্স: মেডুলার উপরে ও মিডব্রেইনের নিচে অবস্থিত। এটি ব্রেইনের বিভিন্ন অংশকে সংযোগ করে।

মিডব্রেইন বা মেসেনসেফেলন: ব্রেইনস্টেমের উপরিভাগে অবস্থিত। এটি সংবেদনশীল তথ্য প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ।

মস্তিষ্কের কাজ:

মানব মস্তিষ্ক হলো শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা শরীরের সব কার্যক্রম, চিন্তাশক্তি, আবেগ এবং শিখনের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের প্রধান কাজগুলো নিম্নরূপ:

১. শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ

মস্তিষ্ক আমাদের শরীরের স্বয়ংক্রিয় কার্যক্রম যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ঘুম-জাগরণের চক্র, হজম প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জীবনধারার কাজও মস্তিষ্কের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ আমরা সচেতনভাবে ভাবিও না, এমন কাজগুলোও মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

২. চলাফেরা ও নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ

মস্তিষ্ক আমাদের শারীরিক নড়াচড়া যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, কথা বলা এবং পেশীর সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি, শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং চলাফেরার সময় সমন্বয় রক্ষা করাও মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটি আমাদের দৈনন্দিন কাজকে নিরাপদ এবং কার্যকর করে।

৩. চিন্তা, শিখন ও সিদ্ধান্ত নেওয়া

মস্তিষ্ক আমাদের চিন্তাশক্তি, শিখন প্রক্রিয়া এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা যা শিখি, কীভাবে নতুন তথ্য গ্রহণ করি এবং জটিল সমস্যার সমাধান করি সবই মস্তিষ্কের মাধ্যমে সম্ভব হয়। এটি আমাদের সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তাকে পরিচালনা করে।

৪. আবেগ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ

মস্তিষ্ক আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ভয়, আনন্দ, রাগ, দুঃখ, উদ্বেগ এসব আবেগ আমাদের মস্তিষ্কের সক্রিয়তার মাধ্যমে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ হয়। শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে আবেগ নিয়ন্ত্রণ শেখানো মস্তিষ্কের বিকাশকে আরও সুসংহত করে।

৫. স্মৃতি তৈরি ও সংরক্ষণ

মস্তিষ্ক আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, দেখানো বা শোনানো তথ্য, পাঠ্যবই থেকে শেখা জ্ঞান সবকিছুকে স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করে। এই স্মৃতি আমাদের ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নেওয়া, সমস্যা সমাধান এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

৬. ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা

আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক থেকে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে। এটি আমাদের চারপাশের পরিবেশ বোঝার, ভাষা শেখা ও ব্যবহার করার, পড়া ও লেখা শেখার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগে দক্ষ হতে সাহায্য করে।

মস্তিষ্কের বিকাশে পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহের প্রভাব

শিশুর মস্তিষ্ক জন্মের পর গর্ভকাল থেকে সাধারণত ৮ বছর পর্যন্ত দ্রুত বিকশিত হয়। এই সময়ে শিশুর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা তার মস্তিষ্কের কোষ বা নিউরনের সংযোগ তৈরি ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কের সুস্থ ও সুষ্ঠু বিকাশে পারিপার্শ্বিক উপাদানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো হলো:

১. পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

শিশুর মস্তিষ্ক সুস্থভাবে বিকশিত হতে হলে সঠিক ও স্বাস্থ্যকর খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণীজ প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণ মস্তিষ্কের কোষের বিকাশে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে শিশু energetic থাকে, মনোযোগ বাড়ে এবং শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বিপরীতে, অস্বাস্থ্যকর বা অনিরাপদ খাবার শিশুর শক্তি, মনোযোগ এবং শেখার সক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

পর্যাপ্ত ঘুমও মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। রাতে পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা শিশুর স্মৃতি, মনোযোগ এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

২. নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

শিশু যখন নিরাপদ ও সুরক্ষিত বোধ করে, তখন সে সহজে শেখে এবং নতুন কিছু জানার চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ে যদি শিশুরা নিরাপদ পরিবেশে থাকে, তারা মনোযোগী ও আত্মবিশ্বাসী হয়। অন্যদিকে, ভয় বা চাপের পরিবেশ শিশুদের শেখার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে।

৩. সামাজিক ও আবেগীয় সহায়তা

শিশুরা ভালো সম্পর্ক এবং স্নেহ পেলে মানসিকভাবে শান্ত থাকে। শিক্ষক, অভিভাবক এবং সহপাঠীদের ইতিবাচক আচরণ শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণ, মনোযোগ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। প্রশংসা, উৎসাহ এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে এবং শেখার আগ্রহ বাড়ায়।

৪. পড়ালেখা ও খেলাধুলা

শিশু যখন গল্প, গান, খেলা বা ছবি দেখে শেখে, তখন তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সক্রিয় হয়। শারীরিক কার্যক্রম যেমন দৌড়ানো, খেলা, নাচ বা ব্যায়াম কেবল শরীরকে নয়, মস্তিষ্ককেও শক্তিশালী করে। খেলাধুলা মনোযোগ, স্মৃতি ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫. চারপাশের পরিবেশ

প্রকৃতি, খোলা মাঠ, বাগান বা খেলাধুলার স্থান শিশুর মনোযোগ, সৃজনশীলতা এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। বিপরীতভাবে, অপ্রিয় বা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘ সময় থাকলে শিশুর মানসিক চাপ বেড়ে যায় এবং শেখার আগ্রহ কমে।

৬. সৃজনশীল উদ্দীপনা

শিশুরা যখন নতুন সমস্যা সমাধান করে, ধাঁধা খেলে, গল্প রচনা করে বা সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশ নেয়, তখন মস্তিষ্কের নতুন সংযোগ তৈরি হয়। শিক্ষকরা যদি শিশুদের নতুন কিছু শেখার এবং চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে তাদের শেখার ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৭. প্রযুক্তির উপযুক্ত ও নিরাপদ ব্যবহার

প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রাখা জরুরি। শিক্ষামূলক খেলা বা ভিডিও শিশুর শেখার জন্য সহায়ক হতে পারে। তবে অত্যধিক সময় ডিভাইস ব্যবহার করলে মনোযোগ কমে যায়, মানসিক চাপ বাড়ে এবং সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সুতরাং, প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত ও লক্ষ্যভিত্তিকভাবে ব্যবহার করা উচিত।

শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে অভিভাবকের করণীয়

শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ কেবল পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বিদ্যালয় পরিবেশও এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ে শিশুর কাটানো সময়, শিক্ষক–শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শেখার অভিজ্ঞতা ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ শিশুর চিন্তাশক্তি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক দক্ষতা ও শেখার আগ্রহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একটি সহায়ক ও শিশুবান্ধব শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর মস্তিষ্কের সুস্থ ও সুষম বিকাশে সহায়তা করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো-

১. নিরাপদ ও ইতিবাচক শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরি করা

শিক্ষকের সহানুভূতিশীল আচরণ, ধৈর্য, উৎসাহব্যঞ্জক ভাষা এবং ন্যায়সংগত দৃষ্টিভঙ্গি শিশুর মধ্যে নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি তৈরি করে। ভয়মুক্ত ও আনন্দময় পরিবেশে শিশু সহজে শেখে এবং নতুন ধারণা গ্রহণে আগ্রহী হয়।

২. বয়স ও সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ

শিশুর বয়স, আগ্রহ ও ব্যক্তিগত সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে পাঠ পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। খুব কঠিন বা খুব সহজ কাজ শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ধাপে ধাপে শেখানো মস্তিষ্কে নতুন সংযোগ গড়ে তুলতে সহায়ক।

৩. খেলাভিত্তিক ও সক্রিয় শিখনের সুযোগ সৃষ্টি

খেলা, গান, ছড়া, দলীয় কাজ ও হাতে-কলমে কার্যক্রম শিশুর চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ায়। সক্রিয় অংশগ্রহণ শিশুর মস্তিষ্ককে উদ্দীপ্ত করে এবং শেখাকে স্থায়ী করে।

৪. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা

শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেওয়া এবং মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া ভাষাগত ও বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক। শিক্ষক–শিক্ষার্থী কথোপকথন শিশুর মস্তিষ্কে চিন্তার গভীরতা তৈরি করে।

৫. আবেগ ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন

শিশুর অনুভূতি বোঝা, তার আচরণের পেছনের কারণ অনুধাবন করা এবং সহানুভূতির সঙ্গে দিকনির্দেশনা দেওয়া আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা গড়ে তোলে। দলগত কাজের মাধ্যমে সহযোগিতা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণ বিকশিত হয়।

৬. সৃজনশীলতা ও অনুসন্ধানী মনোভাব জাগ্রত করা

শুধু মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা নয়, বরং চিন্তা করতে শেখানো, নতুন ধারণা অনুসন্ধানে উৎসাহ দেওয়া শিশুর মস্তিষ্কের উচ্চতর কার্যক্রম সক্রিয় করে। ভুলকে শেখার অংশ হিসেবে গ্রহণ করলে শিশু নির্ভয়ে নতুন কিছু চেষ্টা করতে পারে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বিদ্যালয় পরিবেশে একজন সচেতন ও সংবেদনশীল শিক্ষক শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। সঠিক দিকনির্দেশনা, ইতিবাচক পরিবেশ ও অর্থবহ শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষক শিশুর বর্তমান শেখা এবং ভবিষ্যৎ সক্ষমতার শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেন।

শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে শিক্ষকের করনীয়

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কারণ বিদ্যালয় শিশুর শিখন, সামাজিকীকরণ এবং মানসিক বিকাশের একটি প্রধান কেন্দ্র। শিক্ষকরা সঠিকভাবে সহায়তা করলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকদের করণীয়গুলো নিম্নরূপ:

১. নিরাপদ, সহনশীল ও উৎসাহব্যঞ্জক শিখন পরিবেশ তৈরি

শ্রেণিকক্ষে এমন পরিবেশ তৈরি করা উচিত যেখানে শিশু ভয় বা শাস্তির কারণে আতঙ্কিত না হয়। ভুল থেকে শেখার সুযোগ দেওয়া, নতুন কিছু চেষ্টা করার স্বাধীনতা প্রদান এবং সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান সম্মান দেখানো শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়ায়। শিক্ষকরা উৎসাহমূলক বক্তব্য, প্রশংসা এবং উদ্দীপক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের শেখার আগ্রহ জাগাতে পারেন।

২. শিশুর বয়স ও বিকাশ অনুযায়ী শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ

শিক্ষকরা বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করতে পারেন যা শিশুর মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে। উদাহরণস্বরূপ, ভিজ্যুয়াল উপকরণ, অডিও ক্লিপ, খেলা, দলগত কার্যক্রম এবং হাতে-কলমে শেখার (hands-on learning) কার্যক্রম শিশুদের কগনিটিভ বিকাশে সহায়তা করে। এ ধরনের কার্যক্রম নিউরাল কানেকশনকে শক্তিশালী করে এবং শিশুর শিখনের প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে।

৩. ভাষাগত ও কগনিটিভ বিকাশে সহায়তা

শিক্ষকরা শিশুর ভাষা ও চিন্তাশক্তি বাড়ানোর জন্য নিয়মিত পাঠ, গল্প বলা, প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা ও সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। নতুন শব্দ শেখানো, ভাব প্রকাশের সুযোগ দেওয়া এবং ভাষা চর্চা মস্তিষ্ককে আরও সক্রিয় ও সৃজনশীল করে।

৪. সামাজিক-আবেগীয় শিক্ষা উন্নয়ন

শিশুর সামাজিক ও আবেগীয় দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষকরা সহযোগিতা, সহানুভূতি, সমস্যা সমাধান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানোর উপর গুরুত্ব দিতে পারেন। সহপাঠীদের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন শিশুদের সামাজিকভাবে পরিপক্ব হতে সাহায্য করে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

৫. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রদান

শিক্ষকরা প্রতিটি শিশুর শেখার গতি এবং ধরন পর্যবেক্ষণ করে তার অনুযায়ী নির্দেশনা দিতে পারেন। প্রশংসা, গঠনমূলক মন্তব্য এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া শিশুর মস্তিষ্কে শেখার প্রতি ইতিবাচক সংযোগ তৈরি করে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

৬. শারীরিক নড়াচড়ার সুযোগ সৃষ্টি

শারীরিক কার্যক্রম যেমন খেলাধুলা, নাচ, ব্যায়াম ইত্যাদি শিশুদের মস্তিষ্ক-শরীর সমন্বয় উন্নত করে। এসব কার্যক্রম নিউরনের সংযোগ বৃদ্ধি করে, মনোযোগ শক্তিশালী করে এবং স্মৃতিশক্তি উন্নত করে।

৭. শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম আয়োজন

শিক্ষকরা সৃজনশীল কাজ, প্রজেক্ট, দলভিত্তিক শিখন এবং বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমের আয়োজন করতে পারেন। এই ধরণের কার্যক্রম শিশুর মস্তিষ্ককে বহুমাত্রিকভাবে বিকাশিত করে, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বাড়ায় এবং কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা জাগিয়ে তোলে।

মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের শিখনের প্রক্রিয়া, আচরণ এবং শিশুর সার্বিক উন্নয়নকে বুঝতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কের প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদা কাজ করলেও তারা একসঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিখন, স্মৃতি, আবেগ, ভাষা ও চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুর মস্তিষ্ক জন্মের পর প্রথম কয়েক বছরে দ্রুত বিকশিত হয়, তাই পুষ্টি, নিরাপদ পরিবেশ, ইতিবাচক সম্পর্ক, খেলাধুলা, সৃজনশীল কার্যক্রম এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজ - সবাই যদি শিশুদের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে পারে, তবে তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ আরও শক্তিশালী হবে এবং শিখনের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশই একদিন একটি শিশুকে সুস্থ, সক্ষম ও চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। অভিভাবকগণ স্নেহ, নিরাপত্তা, খেলাধুলা, ভাষাচর্চা, পুষ্টি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে প্রধান ভূমিকা রাখেন। শিক্ষকগণ শেখার পরিবেশ, উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল, সামাজিক-আবেগীয় শিক্ষা, এবং বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বিকাশকে শক্তিশালী করেন।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী(রেফারেন্স)

1. **Gray, H.** (2000). *Anatomy of the human body* (20th ed.). Bartleby.com. https://www.bartleby.com/107/
২. **Sylwester, R.** (1995). *How to explain a brain*. Association for Supervision and Curriculum Development.

অধ্যায় ৫: একীভূত শিক্ষা

শ্রেণিকক্ষকে বলা হয় একটি জীবন্ত শিক্ষণ পরিবেশ। এখানে প্রতিটি শিশু তার নিজস্ব আগ্রহ, ইচ্ছা, সক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ইত্যাদি নিয়ে শেখার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি শিশু ভিন্নভাবে শেখে; কেউ দ্রুত, কেউ ধীর, কারো সহায়তা দরকার, কেউ শুনে, কেউ দেখে, কেউবা স্পর্শ করে, কেউবা অন্যের সাথে শেয়ার (বিনিময়) করে শেখে। । এই বৈচিত্র্যতা শুধু বাস্তবতা নয়, বরং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশগত বৈশিষ্ট্য এবং তার মৌলিক অধিকার। এই বৈচিত্র্যকে সম্মান জানানো এবং প্রতিটি শিশুর প্রয়োজন অনুসারে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করাই হলো শিশুর অধিকার (Child Rights)-এর মূল ভিত্তি। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (United Nations Convention on the Rights of the Child-UNCRC) স্পষ্টভাবে প্রতিটি শিশুর, তাদের ভিন্নতা নির্বিশেষে, সমঅধিকার, বৈষম্যহীন অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার কথা ঘোষণা করেছে। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো এই বৈচিত্র্যতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে না দেখে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক/একীভূত পরিবেশ (Inclusive Environment) তৈরি করা। বৈচিত্র্যতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমেই শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হয়। ফলে শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দক্ষতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে। এসব উপাদানই শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বৈচিত্র্যতার প্রতি সম্মান দেখানো মানে প্রতিটি শিশুর অধিকারকে বাস্তবায়ন করাএবং এটিই গুণগত শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি।

শিশুর বৈচিত্র্যপূর্ণ শিখন আচরণ

শিশুর বৈচিত্র্যপূর্ণ শিখন আচরণ হলো প্রতিটি শিশু জ্ঞান অর্জন, দক্ষতা প্রদর্শন এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়। এই ভিন্নতা কেবল পারদর্শিতার মাত্রায় সীমাবদ্ধ নয়–বরং এটি প্রতিটি শিশুর নিজস্ব সামর্থ্য, শিখন শৈলী (যেমন: দেখে, শুনে বা হাতে-কলমে শেখা), বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা (যেমন: ভাষাগত বা গাণিতিক), সামাজিক পটভূমি এবং আগ্রহ ইত্যাদির কারণে হয়ে থাকে। যেমন, কোনো শিক্ষার্থী দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করে, আবার কেউ তুলনামূলকভাবে বেশি সময় বা সহায়তা চায়, কিংবা পারে না। প্রতিটি মানুষই ভিন্ন হওয়ায়, তাদের সামর্থ্যকে একক বা নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বরং এই বৈচিত্র্যই শ্রেণিকক্ষের একটি শক্তিশালী সম্পদ, যা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। শিক্ষক যখন এই ভিন্নতাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত ও সম্মান করে এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেন, তখনই একটি সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক/একীভূত ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ তৈরি হয়। যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অর্জন করতে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ শিখন আচরণ বলতে সেই ধারণাকে বোঝায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা শেখা, বোঝা, প্রক্রিয়া, গতিবিধি, আগ্রহ, সক্ষমতা, পটভূমি, ভাষা, সাংস্কৃতিক পরিচয়, শারীরিক বা মানসিক সক্ষমতা ইত্যাদির দিক থেকে একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়। অর্থাৎ সকল শিশু এক নয়; তারা শেখে, বোঝে ও প্রতিক্রিয়া দেখায় তাদের নিজস্ব শিখন ধরন অনুযায়ী। (Tomlinson, ২০১৪)

শিশুদের বৈচিত্র্যপূর্ণ শিখন আচরণের কারণ

শিশুরা একই পরিবেশে থেকেও ভিন্নভাবে শেখে। কারণ শিশুর শিখন আচরণকে নির্ধারণ করে ভাষাগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জৈবিক, জ্ঞানীয়, এবং প্রাতিষ্ঠানিক বহু উপাদান। যেমন:-

১। পরিবারভিত্তিক বৈচিত্র্য

- যেসব পরিবারে শিক্ষা-সচেতনতা, রুটিন, শেখার অভ্যাস আছে, সেখানে শিশু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগঠিত, মনোযোগী শিখন আচরণ গড়ে তোলে। অন্যদিকে, অগঠিত/বিশৃঙ্খল পরিবারিক পরিবেশে বড় হওয়া শিশুদের আচরণে অস্থিরতা, নির্দেশ অনুসরণের দুর্বলতা, মনোযোগের ঘাটতি ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।
- ডায়ালগ-মুখী, সহায়ক প্যারেন্টিং শিশু মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সমস্যা সমাধান এবং জিজ্ঞাসা-মনস্কতা তৈরি করে। কর্তৃত্বপরায়ণ বা অবহেলাপন্থী প্যারেন্টিং শিশুর মধ্যে উদ্বেগ, এড়ানো, বা কম অংশগ্রহণমূলক আচরণ তৈরি করতে পারে।

২। ভাষাগত বৈচিত্র্য

- যেসব শিশু প্রতিদিন সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার, গল্প, ব্যাখ্যা, কথোপকথন শোনে, তাদের বোধগম্যতা ও প্রকাশ ক্ষমতা দ্রুত বিকাশ করে। যারা ভাষিক দারিদ্র্যেথাকে/ যে সকল শিশুদের প্রতিদিন সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার, গল্প, ব্যাখ্যা, কথোপকথন শোনার সুযোগ সীমিত থাকে বা একেবারেই থাকে না, তারা ধীরগতির ভাষা-বিকাশের কারণে শিখন-শেখানো কাজে অংশ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে।
- যেসব শিশু বাড়িতে একাধিক ভাষা শোনে, তাদের জ্ঞানগত নমনীয়তা (কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি- শিশুর চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করার ক্ষমতা, নতুন তথ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা সমাধান করা) বেশি হয়, ফলে তারা দ্রুত কনসেপ্ট শিফট/ ধারণা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারে। তবে একই শিশু যদি ভাষাগত সাপোর্ট না পায় তবে তার নির্দেশনা বুঝতে দেরি হয় যা তার আচরণে অনাগ্রহ ও বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।

৩। পরিবেশগত অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য

- যে সকল শিশু বিভিন্ন খেলা, গল্প, ভ্রমণ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া পায়, তারা শ্রেণিকক্ষে বেশি কৌতূহলী ও অনুসন্ধানী হয়। অপরদিকে এই সকল ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা শিশুকে সংকীর্ণ মানসিকতা, নতুন কিছু শিখতে অনাগ্রহ প্রভৃতি আচরণে আটকে রাখে।
- নিরাপদ, সহায়ক পরিবেশে বড় হওয়া শিশু আত্মবিশ্বাসী, সহযোগী ও উন্মুক্ত আচরণ দেখায়। চাপ, অশান্তি, বা দারিদ্র্য-সম্পর্কিত স্ট্রেস শিশুর মনোযোগ কমায়, অস্থিরতা বাড়ায় এবং শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করা শিশুর জন্য কঠিন হয়ে যায়।

৪। জৈবিক ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল বৈচিত্র্য

- প্রতিটি শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের গতি ভিন্ন। এই ভিন্নতাই প্রতিটি শিশুর শেখার গতি, আচরণ ও দক্ষতা অর্জনে পার্থক্য তৈরি করে।
- নিউরাল সংযোগ (মস্তিষ্কের ভিতরে নিউরন (brain cells)এর মধ্যে তৈরি হওয়া যোগাযোগের পথ) তৈরির হার, মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা, মোটর স্কিলস (শিশুর পেশি, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সমন্বয় ব্যবহার করে নড়াচড়া করার ক্ষমতা)সবই শিশুভেদে ভিন্ন। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সময় যত বেশি নিউরাল সংযোগ তৈরি হয়, শিশুর চিন্তা করার দক্ষতা, ভাষা বোঝা, স্মৃতি, মনোযোগ, সমস্যা সমাধান, শেখার গতি ইত্যাদি দ্রুত ও শক্তিশালী হয়।

৫। সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য

- সংস্কৃতি শিশুদের শেখার পদ্ধতি ও আচরণকে প্রভাবিত করে। যেমন- যে সমাজে গল্প ও জিজ্ঞাসা-ভিত্তিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে শিশুদের অনুসন্ধানী আচরণ বেশি বিকাশ পায়।

- সাংস্কৃতিক ধারণা ও প্রথা শেখার আগ্রহ ও অংশগ্রহণে প্রভাব ফেলে। যেমন- কোনো সমাজে মুখস্থ করা বা পরীক্ষার প্রস্তুতি বেশি প্রাধান্য পায়, শিশু স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষাভিত্তিক মুখস্ত শিক্ষার দিকে ঝুঁকে যায়।

৬। শিশুর শিখন আচরণে আগ্রহ, প্রেরণা ও ব্যক্তিত্বগত বৈচিত্র্য

- কিছু শিশু নতুন কাজ বা চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহী থাকে, অন্যরা সতর্ক বা পিছিয়ে থাকে। যেমন- নতুন খেলার নিয়ম শেখার সময় কেউ দ্রুত অংশগ্রহণ করে, কেউ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকে।
- বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তার কারণে একেক শিশু একেকভাবে শিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কোন কোন শিশু ভিজ্যুয়াল লার্নার, কেউবা অডিটরি, কেউবা আবার সামাজিক ইন্টারঅ্যাকশন/ মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক। যেমন- কেউ ছবি দেখে ভালো শিখে, কেউ শুনে বা গ্রুপ ডিসকাশনে বেশি সুবিধা পায়।
- কেউ একা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, কেউ গ্রুপে বেশি সক্রিয়। কারো কারো দলের মধ্যে সহযোগিতা বা নেতৃত্ব নেওয়ার ক্ষমতাও ভিন্ন।

৭। বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষণ কৌশলের বৈচিত্র্য

- বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষণ-পদ্ধতি শিশুর শিখন আচরণ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সহায়ক, সংবেদনশীল ও উৎসাহদায়ী শিক্ষক শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস ও সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে সক্ষম হন। শিক্ষক যখন শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দেন, প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন এবং ভুলকে শেখার স্বাভাবিক অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন শিশু নির্ভয়ে শিখনে অংশ নেয় এবং অনুসন্ধানী আচরণ প্রদর্শন করে। বিপরীতে, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক, একমুখী বা ভয়ভিত্তিক শিক্ষণ কৌশল শিশুর মধ্যে উদ্বেগ, নীরবতা, ভুল করার ভয় ও নিষ্ক্রিয় আচরণ সৃষ্টি করতে পারে।
- বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল (যেমন খেলাভিত্তিক শিখন, দলগত কাজ, আলোচনা, ভিজ্যুয়াল উপকরণ, হাতে-কলমে কার্যক্রম) ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক যখন শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা ও সক্ষমতার প্রতি সাড়া দেন, তখন শ্রেণিকক্ষে শিখন আচরণের ইতিবাচক বৈচিত্র্য বিকশিত হয়। নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহযোগিতামূলক বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুদের মনোযোগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক দক্ষতা এবং ধারাবাহিক শিখন আচরণ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

৮। বিশেষ চাহিদা এবং প্রতিবন্ধকতার কারণে শিখন আচরণের বৈচিত্র্য

- মনোযোগ ও কগনিটিভ সমস্যা যেমন Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) একটি বিকাশজনিত চ্যালেঞ্জ যা শিশুর মনোযোগজনিত সমস্যা, শিশুকে নির্দেশনা অনুসরণে, কাজ সম্পন্ন করতে বা দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে বাধা দেয়। ফলে কোন কোন শিশুর শেখার ধরন, অংশগ্রহণ এবং আচরণ অন্যান্য শিশুদের তুলনায় আলাদা হতে পারে।
- অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD) শিশুর বিকাশজনিত চ্যালেঞ্জ যা তার সামাজিক-আবেগিক মিথস্ক্রিয়া অন্যের সাথে যোগাযোগ এবং নিজ অনুভূতি প্রকাশ এর ক্ষেত্রে বাধা তৈরি কর। ফলে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষণ পরিবেশে সহপাঠী ও শিক্ষকের সঙ্গে আচরণ, জিজ্ঞাসা করার প্রবণতা, এবং গ্রুপ কাজের অংশগ্রহণ সীমিত বা বিশেষভাবে হয়।
- ডিসলেক্সিয়া ও ভাষাগত/শব্দগত সমস্যা (Dyslexia & Language-based Difficulties) অর্থাৎ পড়া, লেখা বা ভাষা বোঝার দক্ষতা ধীরতা বা চ্যালেঞ্জ। এর ফলে শিশু মুখস্থ বা রুটিন কার্যক্রমে ভালো করতে পারে, কিন্তু উচ্চ-স্তরের বিশ্লেষণ বা সমস্যা সমাধানে আলাদা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

- শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে বা সহপাঠীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ ও পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যতা দেখায়। শারীরিক চলাচলের প্রয়োজন হয় এমন কার্যক্রমে বিদ্যালয়ের ভৌতিক অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জের ফলে (যেমন: ল্যাবরেটরি, মাঠে খেলা, বোর্ড ব্যবহার) তারা সরাসরি অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা বাধার সম্মুখীন হয়।

শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যতা

শ্রেণিকক্ষ হলো একটি গতিশীল শিক্ষণ/শিখন-শেখানো ক্ষেত্র যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একে অপরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে একে অপরের সাথে তাদের জ্ঞান বিনিময় করে। এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকে–যেমন বুদ্ধিমত্তা, শখ, অভ্যস্ততা, আগ্রহ, সামর্থ্য, মনোভাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি, শারীরিক সক্ষমতা এবং শিখন ধরন। এই বৈচিত্র্যতা শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক সামর্থ্যকে গড়ে তোলে এবং শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন ধরন আলাদা (কেউ দেখে, কেউ শুনে, কেউ স্পর্শ করে, আবার কেউ হাতে-কলমে কাজ করে শেখে) এবং তাদের বুদ্ধিমত্তাও বহুমুখী (যেমন ভাষাগত, গাণিতিক বা শারীরিক)। এছাড়াও, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা এবং মূল্যবোধের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকে, যা কেবল চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে না, বরং শিক্ষাকে একটি শক্তিশালী উৎসে পরিণত করে। অন্যদিকে, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার বৈচিত্র্যতা থাকায় শিক্ষকের দায়িত্ব হলো সবার জন্য উপযুক্ত সমর্থন ও সহায়ক উপকরণ নিশ্চিত করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক/একীভূত পরিবেশ তৈরি করা। এই বৈচিত্র্যকে সঠিকভাবে গ্রহণ এবং কাজে লাগানোর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা সম্ভব; কারণ এটি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, তাদের সামাজিক দক্ষতা উন্নত করে এবং তারা একে অপরের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল হতে শিখায়, যা শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বৈচিত্র্যময় শিখন আচরণের ফলে 'শিখন শেখানো সম্ভাবনা-চ্যালেঞ্জ-সমাধান'

শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় শিখন আচরণ একটি অনিবার্য বাস্তবতা। সঠিক কৌশল ও পরিকল্পনা, ইতিবাচক ও অন্তর্ভূক্তিমূলক/একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীই নিজের সর্বোচ্চ বিকাশের সুযোগ পায়। তাই শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় শিখন আচরণকে সম্পদ হিসেবে দেখা প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন আচরণে বৈচিত্র্য থাকা মানে শুধু চ্যালেঞ্জ নয়; বরং এটি শিক্ষণের জন্য নানা ইতিবাচক সম্ভাবনা তৈরি করে।

সম্ভাবনা (Opportunities)

- যখন একটি শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শিখন ধরনের শিক্ষার্থী (যেমন ভিজ্যুয়াল, অডিটরি ও কাইনেসথেটিক) থাকে, তখন শিক্ষক একই বিষয়কে ছবি, আলোচনা, গল্প, কাজ করে শেখা ইত্যাদি একাধিক উপায়ে উপস্থাপন করতে পারেন। এর ফলে শুধু মুখস্থ শেখা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর বোঝাপড়া ও দীর্ঘস্থায়ী শিখন গড়ে ওঠে।
- ভিন্ন পারিবারিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা থেকে আসা শিক্ষার্থীরা যখন একসাথে শেখে, তখন তারা নিজেদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা একে অপরের সাথে ভাগ করে নেয়। এতে শ্রেণিকক্ষের শিখন আরও সমৃদ্ধ হয়। যেমন একজন স্বল্পভাষী (introverted) শিক্ষার্থী সহপাঠীর কাছ থেকে যোগাযোগের কৌশল শিখতে পারে, আবার একজন অতিরিক্ত কথা বলা (extroverted) শিক্ষার্থী অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে।
- বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শেখায়। তারা শুধু তথ্য গ্রহণ করে না, বরং প্রশ্ন করতে শেখে, যুক্তি খোঁজে এবং সমালোচনামূলকভাবে (critical thinking) বিষয়টি বিশ্লেষণ করে।

- ভিন্ন দক্ষতা ও সক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা দলগত কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এতে তারা পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়িত্ব ভাগাভাগি এবং সামাজিক দক্ষতা অর্জন করে। যেমন ঝুঁকি নিতে আগ্রহী শিক্ষার্থী নতুন ধারণা দিতে পারে, আর সতর্ক শিক্ষার্থী সেই ধারণা যাচাই ও পরিমার্জনে সহায়তা করতে পারে।
- সমস্যা সমাধানে একাধিক উপায় প্রয়োগের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকশিত হয়। তারা বুঝতে শেখে যে একই সমস্যার একাধিক গ্রহণযোগ্য সমাধান থাকতে পারে।
- বৈচিত্র্যময় শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার্থীদের ভিন্নতাকে সম্মান করতে শেখায়। যখন একজন শিক্ষার্থী দেখে যে তার সহপাঠী তার থেকে ভিন্নভাবে শিখছে বা চিন্তা করছে, তখন সে ধীরে ধীরে পার্থক্যকে স্বাভাবিক ও মূল্যবান হিসেবে গ্রহণ করতে শেখে। এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ভিত্তি তৈরি করে।
- এই ধরনের শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের বহুসাংস্কৃতিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য প্রস্তুত করে, যেখানে বিভিন্ন মত, আচরণ ও সক্ষমতার মানুষের সাথে কাজ করতে হয়।
- ফলে শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে বৈচিত্র্যকে সম্মান জানিয়ে নিজের শেখার দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয় এবং আজীবন শিখনের মানসিকতা গড়ে তোলে।

চ্যালেঞ্জ (Challenges)

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন গতি, আগ্রহ ও সক্ষমতা ভিন্ন হওয়ায় একটি নির্দিষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতি সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর হয় না। ফলে দ্রুত শিখনকারী শিক্ষার্থীরা বিরক্ত ও অনাগ্রহী হয়ে পড়ে, আর ধীর শিখনকারী শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে।
- বৈচিত্র্যময় শিখন আচরণের কারণে শ্রেণিকক্ষে আচরণ ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে শিক্ষকের উল্লেখযোগ্য সময় আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যয় হয়।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি, উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন এবং ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা শিক্ষকের জন্য সময়সাপেক্ষ ও মানসিকভাবে চাপসৃষ্টিকারী হতে পারে।
- বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব থাকলে বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা আরও কঠিন হয়ে ওঠে।
- ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ব্যাহত হতে পারে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং শিখনে অংশগ্রহণ কমে যায়।
- একই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি সব শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিখন অগ্রগতি প্রতিফলিত করতে পারে না। ভিন্ন সক্ষমতা ও বিশেষ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থীকে প্রথাগত লিখিত মূল্যায়নে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়, যা তাদের প্রকৃত দক্ষতা প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

সমাধানসমূহ (Solutions)

- বৈচিত্র্যময় শিখন চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষককে একই পাঠ বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যেমন ভিজ্যুয়াল উপকরণ ব্যবহার, গল্প ও আলোচনা, হাতে-কলমে কাজ এবং খেলাভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে পাঠকে সবার জন্য বোধগম্য করে তোলা।
- ভিন্ন দক্ষতা ও শিখন শৈলীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছোট ছোট গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে, যাতে তারা একে অপরকে সহায়তা করে শিখতে পারে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিখন আরও কার্যকর হয়।

- শিক্ষার্থীদের শিখন আচরণ, আগ্রহ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে কাজ নির্ধারণ (differentiated tasks) করা হলে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী শিখনে অংশ নিতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষে নিয়ম ও প্রত্যাশা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা করা জরুরি, যাতে শিক্ষার্থীরা কোন আচরণ গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয় তা বুঝতে পারে। একই সাথে নিয়ম ভঙ্গের যৌক্তিক ও ধারাবাহিক ফলাফল নির্ধারণ করলে শৃঙ্খলা বজায় থাকে।
- ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষক সহজ ভাষা, উদাহরণ, ভিজ্যুয়াল সংকেত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরাবৃত্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে যোগাযোগকে আরও কার্যকর করতে পারেন।
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ, মৌখিক উপস্থাপন, প্রকল্পভিত্তিক কাজ ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন (formative assessment) অন্তর্ভুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিখন অগ্রগতি আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

একীভূত শিক্ষা

সকল শিশুর শিখন চাহিদা পূরণের একটি টেকসই ও কার্যকর মাধ্যম হল একীভূত শিক্ষা। একীভূত শিক্ষা মূলত এমন একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য, সক্ষমতা ও চাহিদার ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিয়ে শেখার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কাজ করে। এর লক্ষ্য হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে রূপান্তর করা, যাতে দরিদ্র, পথশিশু, শ্রমজীবী শিশু, সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশু এবং প্রতিবন্ধীসহ সকল শিশুর সমান শিক্ষাধিকার নিশ্চিত হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (১৯৪৮)-এর ধারা ২৬ স্পষ্টভাবে প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার কথা ঘোষণা করেছে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই দর্শনের বাস্তব প্রয়োগই একীভূত শিক্ষার ভিত্তি। এটি কেবলমাত্র 'সবার জন্য শিক্ষা' কেবল একটি প্রতিশ্রুতি নয়, বরং এমন একটি কাঠামো, যা আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ সকল শিশুকে সমান সুযোগে শিক্ষালাভে সুযোগ করে দেয়।

ইউনেস্কো (২০০১) একীভূত শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছে "একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, যার উদ্দেশ্য যে কোনো ধরনের বৈষম্য দূর করে বৈচিত্র্য, ভিন্ন চাহিদা, সামর্থ্য ও সামাজিক প্রত্যাশাকে সম্মান জানিয়ে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।"

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, ২০১২) এর বিবেচনায়, "সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অবস্থান করা এবং শিক্ষা শেষে একটি গ্রহণযোগ্য কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে কাজ করা।"

বাস্তব অর্থে, একীভূত শিক্ষা হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর শিখন বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে একই পরিবেশে, একই শিক্ষকের অধীনে শেখার সুযোগ গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে শিক্ষায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক সামাজিক কাঠামো ভেঙে একটি অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক/একীভূত সমাজ তৈরির পথ সুগম করে।

একীভূত শিক্ষার পটভূমি

'একীভূত শিক্ষা' ধারণাটি আপাতদৃষ্টিতে নতুন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর ভিত্তি রচিত হয় ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত 'মানবাধিকার সনদ' এর মাধ্যমে। এ সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, সকলের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে এবং এ অধিকার সবার জন্য সমান। জাতিসংঘ সনদ প্রদানের পর নব্বই দশকে একীভূত শিক্ষা ধারণাটির প্রকৃত প্রসার

শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ধরণের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণা প্রণীত হতে থাকে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হল:

- ১৯৪৮ সালে Universal Declaration of Human Rights (সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ)
- ১৯৮৯ সালে UN Convention on the Rights of Child (শিশু অধিকার সনদ)
- ১৯৯০ সালে The World Declaration on Education for All (সবার জন্য শিক্ষা ঘোষণা)
- ১৯৯৩ সালে The UN Standard Rules (আদর্শায়িত বিধিমালা)
- ১৯৯৪ সালে Salamanca Statement and Framework for Action on Special Education Needs (শিক্ষায় বিশেষ চাহিদা সম্পর্কিত সালামানকা সম্মেলন)
- ২০০০ সালে Dakar Framework for Action (ডাকার সম্মেলন)
- ২০০৬ সালে UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ)

একীভূত শিক্ষার ধারণার বিবর্তন

শিক্ষায় সর্বজনীনতা বা সমান সুযোগের ধারণা ইতিহাসের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়েছে। এর চারটি প্রধান ধাপ চিহ্নিত করা যায়:

১। এক্সক্লুশন (Exclusion) বা বাদ পড়া

শুরুতে সমাজের সংখ্যালঘু বা বৈচিত্র্যপূর্ণ গোষ্ঠী–যেমন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র বা নারী–মূলধারার শিক্ষার বাইরে থাকত। তারা আর্থিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো। এই প্রক্রিয়াটিকে এক্সক্লুশন বলা হয়।

২। সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ

বাদ পড়া গোষ্ঠীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় বা বিশেষ সেবা প্রদান করা হয়, যাতে তারা কিছুটা সুযোগ পায়। তবে এই ব্যবস্থা তাদের মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে একত্রিত করে না, ফলে সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। এটি হলো সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ।

৩। ইন্টিগ্রেশন (Integration) বা সমন্বিত ব্যবস্থা

সময়ের সঙ্গে লক্ষ্য স্থির করা হয়, যেন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থীরা মূলধারার বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সময় তাদের জন্য প্রয়োজনে সহায়ক ব্যবস্থা রাখা হয়, যেমন বিশেষ শিক্ষাসামগ্রী বা সহায়তা, কিন্তু সেবা কাঠামো এখনও আংশিকভাবে আলাদা থাকে। ফলে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কিছু বৈষম্য এবং পৃথকীকরণ রয়ে যায়।

৪। ইনক্লুসিভ (Inclusive) বা অন্তর্ভূক্তিমূলক বা একীভূত শিক্ষা

সর্বশেষ এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ধারা হলো ইনক্লুসিভ শিক্ষা। এতে সকল শিক্ষার্থী–শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য নির্বিশেষে–সমানভাবে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ, সহায়ক এবং সমান সুযোগের পরিবেশ তৈরি করা হয়, যাতে তারা কখনও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক/একীভূত শিক্ষা হিসেবে অবিহিত করা হয়।

একীভূত শিক্ষার বিবেচ্য বিষয়

- একীভূত শিক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য হলো সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

- বিচ্ছিন্ন বা একক কার্যক্রমের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোগ ও কার্যক্রমকে শিক্ষার মূলধারার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত করতে হবে।
- একীভূত শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট বা পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যগোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করে না। বরং, পরিবেশ, বিশেষ পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীর বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে এর প্রয়োগ পদ্ধতি ও লক্ষ্য নির্ধারিত হবে। এর লক্ষ্যদল যেমন, ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু, নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশু, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শিশু, শারীরিক ও বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী শিশু, শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু, বাক প্রতিবন্ধী শিশু, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু, অতি মেধাবী শিশু ইত্যাদি।
- শিখন-শেখানোকার্যক্রমের কৌশল নির্ধারণ এবং সকল ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সাম্য নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- একীভূতকরণের সময় একটি পরস্পর-অংশগ্রহণমূলক সামাজিক মডেল গ্রহণ করা অপরিহার্য। এই মডেলের মাধ্যমে সামগ্রিক বিবেচনা নিশ্চিত করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব শিখন চাহিদা তাদের সম্ভাবনা অনুযায়ী পূরণ করা যায়।

একীভূত শিক্ষা: যা নয়

- কোনো সুবিধাবঞ্চিত বা প্রতিবন্ধী গোষ্ঠীকে আলাদা করে শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালানো। যেমন- বস্তিবাসী শিশুদের জন্য মূল স্কুলের বাইরে আলাদা 'বস্তি স্কুল' চালানো বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ স্কুল।
- এক দল শিক্ষার্থীকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে অন্য দলকে অগ্রাহ্য করা। যেমন, মেধাবী শিশুদের উন্নয়ন ক্লাস চালু রেখে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য সমর্থন না রাখা।
- লিঙ্গভিত্তিক পৃথক বিদ্যালয় বা ব্যবস্থা পরিচালনা করা।
- ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। যেমন- মন্দিরভিত্তিক বা মসজিদভিত্তিক আলাদা শিক্ষা কেন্দ্র চালানো।
- পথশিশু/কর্মজীবী শিশুর জন্য এলাকাভিত্তিক আলাদা স্কুল পরিচালনা করা। সেটা alternative education support হতে পারে, কিন্তু এটি "inclusive education" নয়। যেমন- কর্মজীবী শিশুদের জন্য আলাদা Grameen Shikha, BRAC-evening school।
- কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের লেবেলিং বা শ্রেণিবদ্ধ করা। যেমন- সবল শিক্ষার্থী, দুর্বল শিক্ষার্থী, 'Slow learner group', 'Special children group', 'Backward section' নামে গ্রুপ তৈরি।

একীভূত শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

একীভূত শিক্ষা একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, শারীরিক ও অন্যান্য প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে সকল শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণ করা যায়। একীভূত শিক্ষা দর্শনের মূল ভিত্তিগুলো হলো:

১) প্রতিটি শিশুর শিক্ষা অর্জনের অধিকার আছে

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্র ও তার সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন/প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, নীতি, প্রথা ও সুযোগ; একইসাথে স্কুলের ভৌত অবকাঠামো সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা। যেকোন ধরনের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শিশু (বস্তির শিশু, পথশিশু,পতিতালয়ের শিশু,কর্মজীবী শিশু, তৃতীয় লিঙ্গের শিশু ইত্যাদি) এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ বা ভর্তির অনুমতি না দেওয়া হয়, কোন আইন বা ধারণা তাদের ভর্তির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বাধা তৈরি করে তবে তা একীভুত শিক্ষার আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

ঘটনা-১

পাঁচ বছর বয়সী রিমু (ছন্দনাম) তার অভিভাবকের সাথে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসেছিল। শিক্ষকগণ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেন যে রিমুকে ভর্তি করানো সম্ভব নয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, রিমু তৃতীয় লিঙ্গের (Third Gender) শিক্ষার্থী হওয়ায় সে শ্রেণিকক্ষে ছেলেদের সাথে বসবে নাকি মেয়েদের সাথে বসবে, সেই বসার স্থান নির্ধারণ করা একটি সমস্যা।

আলোচনা: এক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকের করণীয় কী কী?

২) প্রতিটি শিশুই স্বতন্ত্র

প্রতিটি শিশু জন্মগতভাবেই ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। তাই তাদের পছন্দ-অপছন্দ, চাহিদা, আগ্রহ, আবেগ, উপলব্ধি ও শিখন-পদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। এই ভিন্নতা কোনো ত্রুটি নয়—এটাই মানবিক বৈচিত্র্যের মূল শক্তি ও সৌন্দর্য। বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় টিকে থাকার জন্য শিক্ষক, প্রশাসন, অভিভাবক, স্টাফ, সহপাঠী ও স্থানীয় সমাজ—সবার কাছ থেকে সম্মানজনক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া অপরিহার্য।

ঘটনা-২

লামিয়া (ছন্দনাম) তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। মাঝে মাঝে সে সহপাঠীদের প্রতি অস্বাভাবিক রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করে, যা শ্রেণিকক্ষের শান্ত পরিবেশ ব্যাহত করে। পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে শিক্ষক প্রায়ই তাকে বকাঝকা করেন। তার এমন আচরণে শ্রেণিকক্ষের মনোযোগ নষ্ট হয়, এবং অন্য শিক্ষার্থীরাও পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

আলোচনা: এক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কী হতে পারে?

৩) সকল শিশুই শেখার সক্ষমতা রাখে

শিখনের গতি ও কৌশলে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও প্রতিটি শিশুই শিখতে সক্ষম। কেউ দ্রুত শেখে, কেউ ধীরে—এটাই স্বাভাবিক বৈচিত্র্য। শিশুর শেখার অক্ষমতা নয়, বরং শেখানোর পদ্ধতি ও পরিবেশই প্রায়শই প্রকৃত বাধা তৈরি করে। অর্থাৎ, শেখার ব্যবস্থায় উপযুক্ত সমন্বয় আনলেই প্রতিটি শিশুর সম্ভাবনা বাস্তবায়ন সম্ভব।

ঘটনা-৩

বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে পাঠদান করার জন্য শিক্ষক একটি আর্ট পেপারে হাতে আঁকা মানচিত্র নিয়ে এসেছিলেন। মানচিত্রটি দেখে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী—সবার মুখে বিস্ময়। কিন্তু শ্রেণির দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীটি চিত্রটি দেখতে না পারায় হতাশ বোধ করছিল।

পরিস্থিতি বুঝে শিক্ষক মানচিত্রটি টেবিলের ওপর রেখে তাকে সামনে ডাকলেন এবং স্পর্শ করে মানচিত্রটি অনুধাবনের সুযোগ দিলেন। মানচিত্রের সীমানায় আঠা দিয়ে ছোট ডালের দানা বসানো ছিল, যাতে রেখাগুলো স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। স্পর্শনির্ভর এই অভিজ্ঞতা পেয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীটি আনন্দে অভিভূত হয়ে ওঠে।

আলোচনা: এক্ষেত্রে শিক্ষকের ইতিবাচক দিকগুলো কী কী?

৪) প্রতিটি শিশুর নিকটস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ

শিশুদের বৈশিষ্ট্য বা সক্ষমতার ভিত্তিতে আলাদা বিদ্যালয় নির্ধারণ করা মানবাধিকার লঙ্ঘন। প্রতিটি বিদ্যালয়কে এমনভাবে সাজানো প্রয়োজন, যাতে ভিন্নতা স্বীকৃত হয় এবং সকল শিশুর চাহিদা পূরণ করা যায়। প্রতিটি শিশু তার বাড়ির নিকটবর্তী স্কুলে ভর্তি হতে পারে, যেখানে অবকাঠামো ও শিক্ষণ পরিবেশ সবার জন্য উপযোগী।

ঘটনা-৪

জামান (ছদ্মনাম) শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং হুইলচেয়ার ব্যবহার করে। যখন সে তার নিকটবর্তী স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে, প্রধান শিক্ষক তার অভিভাবককে বলেন "এখানে পর্যাপ্ত র‍্যাম্প নেই। হুইলচেয়ার নিয়ে আপনার সন্তান এখানে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বরং সেই স্কুলে ভর্তি করান, যেখানে র‍্যাম্প সুবিধা আছে।" এই পরিস্থিতি দেখায় যে, স্কুলের অবকাঠামো এবং প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত না হলে শিশুর নিকটস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার ব্যাহত হয়।

আলোচনা: এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হতে পারে?

একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রসমূহ

একীভূত শিক্ষা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলো বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন-

ক্ষেত্রসমূহ (Dimensions)	
প্রবেশযোগ্যতা (Access)	প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করে যে সকল শিক্ষার্থী–তাদের সক্ষমতা, চাহিদা বা পরিস্থিতি নির্বিশেষে–শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং শিখনের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। এটি শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি ও সমতা নিশ্চিত করার মূল ভিত্তি। প্রবেশযোগ্যতার বিভিন্ন দিক রয়েছে: ✓ শারীরিক প্রবেশযোগ্যতা: বিদ্যালয় পর্যন্ত পথ, প্রয়োজনীয় যানবাহন , শ্রেণিকক্ষের প্রবেশপথ, ওয়াশরুম প্রভৃতিতে হুইলচেয়ার বা চলাচলের সুবিধা। ✓ শিক্ষাক্রমিক প্রবেশযোগ্যতা: নমনীয় শিক্ষাক্রম, ভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী শিখন-পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমে সমন্বয়। ✓ সামাজিক প্রবেশযোগ্যতা: সমাজ, সহপাঠীদের ও অভিভাবকবৃন্দের ইতিবাচক মনোভাব এবং সমর্থন। ✓ সাংস্কৃতিক প্রবেশযোগ্যতা: বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সহশিক্ষাক্রমিক দিক অন্তর্ভুক্ত করা।
বিদ্যালয়ে ভর্তি (Enrolment)	প্রবেশযোগ্যতার পরে একীভূত শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে সমানভাবে ভর্তির সুযোগ প্রদান। অনেক শিশু, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর, মেয়ে এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা মূলধারার বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় নানা বাধার সম্মুখীন হয়। একীভূত শিক্ষার নীতি অনুযায়ী, এই সকল শিশুকে অন্যদের মতো সমান সুযোগ ও সহায়তা নিশ্চিত করে বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ প্রদান করা অপরিহার্য।
বিদ্যালয়ে উপস্থিতি (Attendance)	শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা একীভূত শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও বিভিন্ন কারণে–যেমন দারিদ্র্য, সামাজিক বা পারিবারিক সমস্যা, নেতিবাচক মনোভাব–নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারে না। একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি শিশু নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং তার শেখার সুযোগ অব্যাহত থাকবে।
সক্রিয় অংশগ্রহণ (Active Participation)	একীভূত শিক্ষা কার্যকর করতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া অপরিহার্য। সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীর সামাজিক ও মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত করে এবং তাদের শেখার প্রক্রিয়ায় নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম করে। অনেক শিশু বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকলেও তারা নানা কারণে শ্রেণিকক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না–যেমন: ✓ তাদের চাহিদা ও সক্ষমতার প্রতি যথাযথ সাড়া না দেওয়া,

	✓ প্রচলিত ও গতানুগতিক শিক্ষণ/ শিখন-শেখানো-পদ্ধতি, ✓ যোগাযোগের সমস্যা, ✓ আচরণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা, ✓ সীমিত সম্পদ ও উপকরণ। একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করে এই বাধাগুলো দূর করে প্রতিটি শিশুকে সমানভাবে শ্রেণিকক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়।
অর্জন (Achievement)	প্রতিবন্ধিতা বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর একাডেমিক/শিক্ষাগত, সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করা একীভূত শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এটি শিক্ষার্থীর সম্ভাবনাময় দক্ষতাকে বাস্তবায়নের সুযোগ প্রদান করে। তবে প্রায়শই কিছু শিক্ষার্থী বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষের প্রতিকূল পরিবেশে তাদের পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। এর পেছনে কারণ হতে পারে: ✓ প্রচলিত ও একইরূপ শিক্ষণ-শেখানোর পদ্ধতি এবং অপরিবর্তনীয় মূল্যায়ন ব্যবস্থা, ✓ সীমিত সম্পদ ও শিক্ষণ উপকরণ, ✓ কঠোর/অনমনীয় ও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা। একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে এই বাধাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান তৈরি করা এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর শেখার সম্ভাবনা অনুযায়ী সমন্বিত শিক্ষণ কার্যক্রম নিশ্চিত করা জরুরি।
শিক্ষাবর্ষ শেষে পরবর্তী ক্লাসে উত্তরণ (Year/Grade Completion)	কোন কোন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা পূরণ এবং শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষাবর্ষ বা গ্রেড সমাপ্তির ধারণা বয়স-উপযোগী শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত। বয়স-উপযোগী শিক্ষা মানে হলো, প্রতিটি শিক্ষার্থী–তাদের প্রতিবন্ধিতা বা শিখন চাহিদা নির্বিশেষে–বয়স ও বিকাশের স্তরের সাথে খাপ খাইয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা। অনেকে নানা কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়তে পারে এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। একীভূত শিক্ষা কার্যকর করতে হলে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত শিক্ষাবর্ষ বা গ্রেড সম্পন্ন করতে পারছে কি না তা মনিটর করা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।
প্রাথমিক চক্র সমাপ্তি (Primary Cycle Completion)	প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো, বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া প্রতিটি শিশু প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করতে পারবে। তবে বাস্তবে দেখা যায়, অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরের সমাপ্তি করতে ব্যর্থ হয়, এবং যারা সম্পন্ন করে তারা প্রান্তিক দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারে না। এর ফলে তারা প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পূর্ণ না করেই শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ে। একীভূত শিক্ষা কার্যকর করতে হলে, প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তির পথে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা এবং প্রতিটি শিশুর জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।
সামাজিক একীভূতকরণ এবং গ্রহণযোগ্যতা (Social Inclusion and Acceptance)	একীভূত শিক্ষায় সামাজিক একীভূতকরণ এবং গ্রহণযোগ্যতা মানে হলো এমন একটি আন্তরিক ও সহায়ক শিক্ষার/সহযগিতামূলক শিখন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে শিক্ষার্থীর পরিচয়, সক্ষমতা বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে তাদের বৈচিত্র্যকে সম্মান ও মূল্য দেওয়া হয়। যখন শিক্ষার্থীরা অনুভব করে যে সমাজে সবার সঙ্গে তাদেরও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তখন তারা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বেশি সক্রিয় হয়, সমবয়সীদের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সব শিক্ষার্থীর সঙ্গে মিলেমিশে থাকার মানসিকতা বিকাশ পায়।

শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে একীভূত শিক্ষা

- ✓ ঝরে পড়া কমানো: শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে স্কুল ত্যাগের হার কমে।
- ✓ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা: সকল শিক্ষার্থী তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী শেখে।
- ✓ অভিভাবক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি: বিদ্যালয়-অভিভাবক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়।
- ✓ শিখন-শেখানোর মান উন্নয়ন: বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণে কার্যক্রম উন্নত হয়।
- ✓ শিক্ষার্থীবান্ধব শ্রেণিকক্ষ: সক্রিয় ও একীভূত পরিবেশ তৈরি হয়।
- ✓ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদান: অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থী সমাজে অবদান রাখে।
- ✓ সামাজিক নৈতিকতা উন্নয়ন: সহপাঠী ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ শিখে।
- ✓ আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি: নিজের ক্ষমতা ও সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া শেখে।
- ✓ বৈচিত্র্য বোঝার ক্ষমতা: সহপাঠীদের ভিন্নতা ও চাহিদা বোঝে।
- ✓ শিক্ষকের শেখার সুযোগ: শিক্ষার্থীদের নতুন ধারণা ও দক্ষতা সম্পর্কে জানতে পারে।
- ✓ শিখন পদ্ধতির জ্ঞান: ভিন্ন সক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে তা বোঝা যায়।
- ✓ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি: শিক্ষকের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ ও পরিচালনার ক্ষমতা উন্নত হয়।
- ✓ চলমান যোগাযোগ: শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে নিয়মিত ও কার্যকর যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

একীভূত শিক্ষা: শিখন-শেখানো

একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ধারণা

একীভূত শিক্ষা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার সক্ষমতা, বৈচিত্র্য বা সীমাবদ্ধতা যাই হোক না কেন-শ্রেণিকক্ষে সে সমানভাবে শিখতে ও অংশ নিতে পারে। এই ধারণা শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও নমনীয়, অংশগ্রহণমূলক এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক করে তোলে। ফলে শিক্ষককে পাঠ ও কার্যক্রম এমনভাবে সাজাতে হয় যাতে কেউ বাদ না পড়ে এবং সকলের শেখা কার্যকর হয়। তাই শিক্ষক শিখন-শেখানো কাজে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল বিবেচনা করতে পারেন। যেমন, জিগসো (Jigsaw), চার কর্নার (Four Corners), প্লেস ম্যাট (Place Mat), গোল টেবিল (Round table), একক চিন্তা- জোড়ায় আলোচনা- উপস্থাপন (Think-pair-share), সংখ্যা-দল (Numbered Heads Together), অনিয়ন রিং (Onion ring), ভূমিকাভিনয় (Role play) ইত্যাদি।

সহযোগিতামূলক শিখন

সহযোগিতামূলক শিখন হলো এমন একটি কৌশল যেখানে শিক্ষার্থীরা কখনো এককভাবে, কখনো জোড়ায় এবং কখনো ছোট দলে একসঙ্গে আলোচনা, কাজ ও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে শেখে। এখানে শিক্ষক নির্দেশক এর ভূমিকায় নয়, বরং সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকেন, যিনি শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক দিকনির্দেশনা দেন এবং নতুন জ্ঞান যোগ করে শিখনকে গভীর করেন। এই শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে শেখার সুযোগ পায় এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আরও সক্রিয়, আনন্দিত ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, তাদের

অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, সহপাঠীদের ওপর আস্থা তৈরি হয় এবং শিক্ষকের ওপর নির্ভরতা ও চাপ তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়।

সহযোগিতামূলক শিখনের মূল উপাদানসমূহ

১. ইতিবাচক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

শিক্ষার্থীরা দলগত সাফল্যের জন্য একে অপরের ওপর নির্ভর করে। তারা সহযোগিতা করে, উৎসাহ দেয় এবং পরস্পরের কাছ থেকে শেখে। দল সফল হবে—যদি সবাই কাজ করে।/ সবাই একসাথে কাজ করলেই দলগতভাবে সফল হতে পারে।

২. মুখোমুখি যোগাযোগ

শিক্ষার্থীদের এমনভাবে বসানো হয় যাতে তারা সরাসরি কথা বলতে পারে, মতামত দিতে পারে এবং শ্রেণিকাজে একে অপরকে তাৎক্ষণিক সহায়তা করতে পারে।

৩. একক দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকে কী করছে তা পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজের মূল্যায়ন হয় ব্যক্তিগত ও দলীয় ফলেদায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে না।

৪. পারস্পরিক ও ছোট দলে কাজের দক্ষতা

দলে সফল হতে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, সহযোগিতা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, বিশ্বাস তৈরি এবং দ্বন্দ্ব সমাধানের দক্ষতা কাজে লাগাতে হয়। শিক্ষক এসব দক্ষতা সচেতনভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চর্চার মাধ্যমে গড়ে তোলেন।

৫. দলীয় কাজের সারমর্মকরণ

দল তাদের কাজ পর্যালোচনা করে দেখে—কে কী করেছে, কোথায় উন্নতি দরকার। শেষে তারা নিজেদের শেখা বিষয় সারাংশ আকারে উপস্থাপন করে।

সহযোগিতামূলক শিখনের বিভিন্ন কৌশল

শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং যৌথ দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে সহযোগিতামূলক শিখন একটি শক্তিশালী পদ্ধতি। শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতা, শিক্ষার্থীর সক্ষমতা ও পাঠের প্রকৃতি বিবেচনায় শিক্ষক এক বা একাধিক কৌশল একত্রে ব্যবহার করতে পারেন। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতামূলক কৌশল উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হলো-

জিগসো (Jigsaw)

এটি একটি সহযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক কৌশল; যা প্রয়োগের ফলে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুর উপর স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই কৌশলে শিক্ষার্থীদের ব্রেইনস্টর্মিং করার সুযোগ থাকে। শিক্ষার্থীরা একে অপরকে শেখানোর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি আয়ত্ত করে।

কীভাবে কাজ করে:

- শিক্ষক প্রথমে একটি বিষয় নির্বাচন করে তা ৪/৫টি অংশে ভাগ করেন।
- একইভাবে শিক্ষার্থীদেরও সমসংখ্যক দলে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি দলকে বিষয়বস্তুর একটি করে অংশ দেওয়া হয়।
- দলগুলো তাদের নির্ধারিত অংশ পড়বে, প্রয়োজনীয় আলোচনায় অংশ নেবে এবং একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ প্রস্তুত করবে।
- অতঃপর নতুন দল গঠন করা হবে। দল গঠনের সময় প্রতিটি আগের দল থেকে অন্তত একজন করে শিক্ষার্থী যেন প্রতিটি নতুন দলে থাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা নতুন দলে গিয়ে নিজেদের পূর্বদল থেকে শেখা বিষয়বস্তুর তথ্য অন্যদের জানাবে।

এই কৌশল ব্যবহার করে শিখন-শেখানোর কার্যক্রম পরিচালনা করলে অল্প সময়েই শিক্ষার্থীরা একে অপরকে শেখানোর মাধ্যমে যে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারে।

চার কর্নার (Four Corners)

এই কৌশল শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশ, যুক্তি উপস্থাপন ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার সুযোগ দেয়।

কীভাবে কাজ করে:

- শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি বিষয়, তথ্য, প্রশ্ন বা সমস্যা উপস্থাপন করেন।
- বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে।
- শিক্ষক আগে থেকেই চারটি কর্নারে চার ধরনের মতামত/বিবৃতি/ছবি টানিয়ে রাখেন এবং প্রতিটির অর্থ ব্যাখ্যা করেন।
- শিক্ষার্থীরা নিজের চিন্তার ভিত্তিতে পছন্দের কর্নারে গিয়ে দাঁড়ায়।
- একই কর্নারে থাকা শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে তাদের যুক্তি শেয়ার করে এবং অন্যদের যুক্তিও জানতে পারে।
- এরপর প্রতিটি কর্নার থেকে একজন প্রতিনিধি তাদের দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করে।
- পুরো আলোচনা চলাকালে শিক্ষক ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল ধারণা যেন না ছড়িয়ে পড়ে, তা বিশেষভাবে নজরে রাখেন।

প্লেস ম্যাট (Place Mat)

এই কৌশল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ভাবনা, দলীয় আলোচনা এবং সম্মিলিত সারমর্ম এই তিন পর্যায়ে শিখতে সহায়তা করে।

কীভাবে কাজ করে

১. শিক্ষক একটি বিষয় উপস্থাপন করেন এবং বড় কাগজে প্লেস ম্যাট–এর মতো উক্ত বিষয়ের উপর একটি ছক তৈরি করেন। চারপাশে ব্যক্তিগত লেখার ঘর থাকে, মাঝখানে থাকে দলীয় সারমর্মের ঘর।
২. শ্রেণিকে পাঠ অনুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দল তাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে সদস্যরা নিজ নিজ ঘরে স্বাধীনভাবে মূল ধারণা বা কীওয়ার্ড লিখে।
৩. সবাই লেখা শেষ করার পর দলীয় আলোচনা হয় যেখানে প্রত্যেকে তার ধারণা ব্যাখ্যা করে।
৪. আলোচনা থেকে পাওয়া সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বা মূল সারমর্ম মাঝের ঘরে লেখা হয়।
৫. অতঃপর প্রতিটি দল তাদের সারসংক্ষেপ পুরো ক্লাসের সামনে উপস্থাপন করে।

গোল টেবিল (Round table)

এই সহযোগিতামূলক কৌশলে অল্প সময়ে বেশি ধারণা সংগ্রহ করা যায় এবং প্রায় সকল শিক্ষার্থীকে কাজে যুক্ত করা সম্ভব হয়।

কীভাবে কাজ করে:

১. শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লাসকে কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করেন।
২. এমন একটি প্রশ্ন দেওয়া হয় যার একাধিক উত্তর বা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে। *উদাহরণ:* "খাদ্যের উপাদান কত প্রকার?", "আদর্শ খাদ্যে কোন উপাদানগুলো থাকে?"
৩. প্রতিটি দলে একটি কাগজ দেওয়া হয়। প্রথম শিক্ষার্থী উত্তর লিখে পাশের সদস্যকে দেয়; এভাবে কাগজ ঘুরতে থাকে এবং সবাই লেখা যোগ করে।
৪. সব সদস্যের লেখা শেষে দলীয়ভাবে একটি সারমর্ম তৈরি করা হয় এবং প্রতিটি দল তা উপস্থাপন করে।

সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-এ ধরনের বিষয় যেখানে উত্তরের ক্ষেত্র একাধিক, সেখানে কৌশলটি সবচেয়ে কার্যকর।

একক চিন্তা- জোড়ায় আলোচনা- উপস্থাপন (Think-pair-share)

এই কৌশল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চিন্তা, সমমনা আলোচনা এবং দলীয় শেয়ারিং—এই তিন স্তরের মাধ্যমে গভীর শিখন ঘটায়।

কীভাবে কাজ করে:

১. শিক্ষক একটি প্রশ্ন বা বিষয় দেন এবং শিক্ষার্থীদের এককভাবে ভাবতে বলেন।
২. তারপর জোড়ায় বসে নিজেদের মতামত বা যুক্তি ভাগাভাগি করতে বলেন। শিক্ষক এসময় ঘুরে ঘুরে সবার বোঝাপড়া পর্যবেক্ষণ করেন।
৩. কয়েকটি জোড়াকে তাদের ভাবনা পুরো ক্লাসের সামনে শেয়ার করতে বলেন।

৪. শেষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলিতভাবে আলোচনার সারকথায় পৌঁছায়।

সংখ্যা-দল (Numbered Heads Together)

এই কৌশলে দলীয় আলোচনা, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও সমষ্টিগত জবাবদিহিতা একইসাথে নিশ্চিত হয়। বিশেষত পুনরালোচনা, পাঠ-সংহতি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে এটি অত্যন্ত কার্যকর।

কীভাবে কাজ করে:

১. শিক্ষক ৫ জন করে দলে ভাগ করবেন এবং প্রতিটি সদস্যকে ১–৫ পর্যন্ত নম্বর দেবেন।
২. নির্দিষ্ট পাঠ থেকে একটি প্রশ্ন বা সমস্যা শিক্ষক তুলে ধরবেন।
৩. শিক্ষার্থীরা প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করবে, তারপর দলীয় আলোচনায় সমাধান নিশ্চিত করবে—এভাবে দলের প্রতিটি সদস্য উত্তরটি জানবে।
৪. নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক যেকোনো একটি নম্বর বলবেন। প্রতিটি দলের ঐ নম্বরধারী শিক্ষার্থী হাত তুলবে এবং যেকোনো একজনকে উত্তর দিতে বলা হবে।
৫. প্রয়োজন হলে অন্যান্য দলের একই নম্বরধারী শিক্ষার্থীরা সংযোজন করবে।

অনিয়ন রিং (Onion ring)

এটি এমন একটি মুখোমুখি আলোচনা কৌশল যেখানে শিক্ষার্থীরা দুটি বৃত্তে দাঁড়িয়ে ধারাবাহিকভাবে মতামত বা তথ্য বিনিময় করে। শব্দভান্ডার অনুশীলন, পরিচিতি, সারসংক্ষেপ ও দ্রুত ধারণা বিনিময়ে এটি অত্যন্ত উপযোগী।

কীভাবে কাজ করে:

১. পুরো ক্লাসকে দুটি দলে ভাগ করা হবে-একটি অভ্যন্তরীণ বৃত্ত এবং একটি বাহ্যিক বৃত্ত, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী মুখোমুখি দাঁড়াবে।
২. পাঠকে দুই অংশে ভাগ করা হবে; অভ্যন্তরীণ দল একটি অংশ, বাহ্যিক দলঅন্য অংশ আলোচনা করবে।
৩. মুখোমুখি দাঁড়ানো শিক্ষার্থীরা নিজেদের অংশটি একে অপরকে ব্যাখ্যা করবে।
৪. নির্দিষ্ট সময় পরে বাহ্যিক (বা অভ্যন্তরীণ) বৃত্ত ঘুরিয়ে নতুন জুটির সাথে আলোচনা করতে দেওয়া হবে, যাতে প্রত্যেকে অনেকের সঙ্গে শেয়ার করতে পারে।

ভূমিকাভিনয় (Role play)

বাস্তব জীবনের ঘটনা বা পরিস্থিতিকে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে শেখার একটি শক্তিশালী কৌশল। সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান খোঁজা, যোগাযোগ দক্ষতা ও সামাজিক আচরণ শিখতে এটি অত্যন্ত কার্যকর।

কীভাবে কাজ করে:

১. শিক্ষক পাঠের সাথে যুক্ত একটি বাস্তবধর্মী পরিস্থিতি বাছাই করবেন।
২. কোন শিক্ষার্থী কোন ভূমিকা নেবে তা নির্ধারণ করে তাদের সময় দেবেন প্রস্তুত হওয়ার জন্য।
৩. শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করবে।
৪. উপস্থাপনা শেষে ক্লাসে প্রতিফলন (reflection) হবে—কি শিখলো, কোন আচরণ বা সিদ্ধান্ত কার্যকর ছিল, কোথায় উন্নতি করা যায় ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও শিখন উপযোগীকরণ কৌশলের ধারণা

❖ **আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ উপযোগীকরণ কৌশলসমূহ হতে পারে:**

- তারা যে চোখে কম দেখে সেটা মেনে নিতে উৎসাহিত করা।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিপদজনক হতে পারে এমন কাজ করতে উৎসাহিত না করা।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সংগে চেঁচিয়ে বা উচ্চস্বরে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, হেয় করে কথা না বলা।
- শ্রেণিকক্ষের মেঝেতে কার্পেট, মাদুর, পাটি, চট ইত্যাদি ব্যবহার করলে উজ্জ্বল রংয়ের হওয়া উচিত এবং মেঝে, দেয়াল ও আসবাবপত্রের রং থেকে ভিন্ন রংয়ের হওয়া উচিত।
- শ্রেণিকক্ষে গাঢ় রং এর চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, টুল ইত্যাদির জন্য উজ্জ্বল রং এর কভার ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সামনের সারিতে বসতে দেওয়া।
- শ্রেণিকক্ষে তার প্রয়োজনমত আলোর ব্যবস্থা করা বা জানালার কাছকাছি বসতে দেওয়া।
- ব্ল্যাকবোর্ডের উপর পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা। বোর্ডটি যেন গাঢ় কালো থাকে এবং অধিক চকচকে ভাব না থাকে তা নিশ্চিত করা।
- ব্ল্যাকবোর্ডে কোন কিছু লেখার ক্ষেত্রে ভালোভাবে পরিস্কার করে লাইনগুলো ফাঁকা করে লেখা।
- বোর্ডে কোন কিছু লেখার সময় আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দেখার সুবিধার জন্য বড় করে লেখা ও একই সাথে মুখে উচ্চারণ করা।
- ব্ল্যাকবোর্ড ও চকের মধ্যে উজ্জ্বল বৈসাদৃশ্য বজায় রাখা।
- কোন বিষয়ের ছবি দেখানোর ক্ষেত্রে লো-ভিশন শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী সেগুলো বড় করে আঁকা এবং উজ্জ্বল রং ও রঙের ছবি ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- দূরে থেকে বোর্ডের লেখা পড়তে না পারলে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে বোর্ডের কাছে নিয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া।
- জটিল ও দুর্বোধ্য ছবি/চিত্র বুঝানোর প্রয়োজনে বাস্তব/অর্ধবাস্তব উপকরণ ব্যবহার করা।
- মোটা দাগযুক্ত ও গাঢ় কালির কলম/পেন্সিল ব্যবহার করতে দেওয়া।
- বড় অক্ষরের ছাপা বইয়ের ব্যবস্থা করা।
- উজ্জ্বল ও মোটা দাগের লাইন টানা খাতা ব্যবহার করতে দেওয়া।
- বইয়ের ভেতরে হালকা ও ঝাপসা কালির লেখা বা ছবি থাকলে তা গাঢ় হাইলাইটস দিয়ে উজ্জ্বল ও গাঢ় করে দেওয়া।

- বড় ও উজ্জ্বল রঙের ছবির কার্ড তৈরি করে নেওয়া যা প্রয়োজনে আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা চোখের কাছে নিয়ে দেখতে পারে।
- সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সাথে জোড়ায় এবং দলগতকাজের সুযোগ রাখা।

❖ **সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ উপযোগীকরণ কৌশলসমূহ হতে পারে:**

- সামনের দিকের সারিতে বসতে দেওয়া।
- পড়া দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেওয়া।
- কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তার নাম ধরে ডাকা।
- শ্রেনিকার্যক্রমে ইশারা/ইঙ্গিত ব্যবহার সীমিত করা, মৌখিক ভাষার ব্যবহার বেশি করা।
- ব্ল্যাকবোর্ডে কোন কিছু লেখার সময় একই সাথে মুখে উচ্চারণ করা।
- চক্ষুস্মান শিক্ষার্থীদের কোন ছবি/চিত্র দেখানোর ক্ষেত্রে সম্ভব হলে স্পর্শযোগ্য বাস্তব বস্তু বা মডেল ব্যবহার করা যায় । একইসাথে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর হাতে তা ধরিয়ে দিয়ে আলোচ্য বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরিবেশ/অবস্থার পার্থক্য বুঝানোর জন্য সম্ভব হলে বাস্তব পরিবেশে নিয়ে যাওয়া অথবা অনুরূপ কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে সে বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।
- কোন বিষয় শেখানোর ক্ষেত্রে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- একটি ধাপ/বিষয় পুরোপুরি আয়ত্বে না আসা অবধি নতুন ধাপ/বিষয়ে শেখানো বন্ধ রাখা।
- জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ে একটু বেশি সময় নিয়ে প্রয়োজনে বারবার বুঝিয়ে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় স্পর্শযোগ্য হলে তার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া।
- শিক্ষার্থী যদি ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে কোন বিষয় লেখা ও পড়ার জন্য কিছুটা সময় বেশি দেওয়া।/ নমনীয়তার সুযোগ রাখা।
- একাধিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে একত্রে না বসিয়ে চক্ষুস্মান সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে বসানো।
- পাঠদান চলাকালীন সময়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যাতে অস্পষ্ট বিষয়ে সহপাঠীর মাধ্যমে জানতে পারে তার অনুমতি থাকা ও অন্যান্য সহপাঠীদের বুঝিয়ে দেওয়া এবং সহযোগিতার মনোভাবকে সর্বদা উৎসাহিত করা।
- পাঠদান ও গ্রহণ সকলের ন্যায় সন্তোষজনক না হলেও বিরূপ মন্তব্য না করা, কার্যকর ফলাবর্তন প্রদান করা এবং অংশগ্রহণের জন্য প্রশংসা করা।
- সকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ বোধক কোন গল্প, অভিজ্ঞতা, কৌতুক ইত্যাদি বলা/উপস্থাপন হতে বিরত থাকা।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চলাচলের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র ক্লাস শুরুর পূর্বেই সারিবদ্ধভাবে গুছিয়ে রাখা।
- শ্রেণিকক্ষের আকার/আয়তন সম্পর্কে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্পর্শের মাধ্যমে নিখুঁত ধারণা প্রদান করা। শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্রের স্থান তাদের না জানিয়ে পরিবর্তন না করা ; কোন কারণে পরিবর্তন করলে পুনরায় তাদেরকে পূর্বের ন্যায় ধারণা প্রদান করা।
- শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্রের কর্নারগুলো যেন সূঁচালো, ধারালো বা তীক্ষ্ণ না হয় এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যেন এ থেকে কোন আঘাত না পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষের আশেপাশে **উঁচু** -নিচু স্থানসমূহ বেড়া/ রেলিং দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া। শ্রেনিকক্ষে ও ওয়াশরুমে ট্যাক্টাইল টাইলস এবং দেয়াল, সুইচ বোর্ড এর ব্যবস্থা রাখা।
- তাদের প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব পরিহার করে বিদ্যালয়/ শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষণীয় কর্মকান্ডে দক্ষতা অনুযায়ী তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যদের তাদের লেখাপড়ার অগ্রগতি/অবনতি সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করা ও সকল কর্মকান্ডে তাদের সম্পৃক্ত করা।
- তাদের বাড়ির কাজ দেওয়া ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ডায়েরি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সকলের ন্যায় তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক স্বরে কথা বলা।
- ঝুঁকিপূর্ন বৈদ্যুতিক তার ও সুইচবোর্ড দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে স্থাপন করা।

❖ **বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ উপযোগীকরণ কৌশল হতে পারে**

- বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সামনের দিকের সারিতে বসতে দেয়া। এক্ষেত্রে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সামনের সারিতে বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে নিরাপদ দূরত্বে থেকে শিক্ষক ও অন্যদের কথা সহজে বুঝতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে থেকে আসা শব্দ কমানোর জন্য দরজা জানালায় ভারি পর্দা ব্যবহার করা বা কৃত্রিম আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে দরজা জানালা বন্ধ রাখা যেতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র নড়াচড়ার সময় যেন ভারি কোন শব্দ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এগুলোর পায়ের তলায় নরম রাবার জাতীয় কিছু লাগিয়ে দেয়া বা শ্রেণিকক্ষে ম্যাট বিছিয়ে তার উপর আসবাবপত্র রাখা যেতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের মুখমন্ডল স্পষ্টভাবে দেখতে পারে।
- কথা বলার সময় শিক্ষকের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভাল বুঝতে পারে। এক্ষত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষক যেন মুখ ঢেকে বা মুখ ঘুরিয়ে কথা না বলেন।
- শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলার আগে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থী জানতে পারবে শিক্ষক তার সাথে কথা বলছেন।
- মুখমন্ডলের অভিব্যক্তি এবং স্বাভাবিক অঙ্গাভঙ্গী ব্যবহার করতে হবে।
- শিক্ষককে পরিস্কার ও স্বাভাবিক গতিতে কথা বলতে হবে এবং শব্দের প্রতিধ্বনি যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- দলীয় আলোচনার সময় বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যেন বুঝতে পারে সে বিষয়টি খেয়াল রাখা।
- যেহেতু এধরনের শিক্ষার্থীর অন্যকে কথা বুঝাতে এবং অন্যের কথা বুঝতে অসুবিধা হয়; তাই তাদের জন্য শ্রেণিকক্ষে একটু বেশি সময় ও বাড়তি মনোযোগ দিতে হয়।
- শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাবলীল স্বরে সরলীকরণ করে কথাবর্তা বলা এবং প্রয়োজন হলে লিখে অথবা ছবি এঁকে দেখানো যেতে পারে।
- বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বাড়ির কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাযেরিতে লিখে দেয়া যাতে তাদের অভিভাবকগণ বাড়ির কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করতে পারে।
- বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করা।

- পাঠদানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। কোন ধাপ বাদ দিলে এ ধরনের শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে।
- এ ধরনের শিক্ষার্থীকে তুলনামূলক শান্ত ও সহায়তাদানে ইচ্ছুক সহপাঠীদের সাথে বসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এরূপ পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। যেমন-মৌখিক পরীক্ষা লিখিতভাবে নেয়া অথবা হাতে কলমে কাজ অথবা বাড়ির কাজ দেয়া।

❖ বুদ্ধি ও বহুবিধ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ উপযোগীকরণ কৌশল হতে পারে

- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতা ও তাদের আচরণের ধরন সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতন থাকা ও সহপাঠীদের সচেতন করা।
- কোন শিক্ষার্থীর কথাবার্তা উচ্চারণ নিয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীরা যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ না করে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করা।
- সহায়ক উপকরণ ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীর চলাচল সহজ করতে শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র সারিবদ্ধভাবে রাখা ও চলাচলের পথ প্রশস্ত রাখা।
- এ ধরনের শিক্ষার্থীকে সামনের সারিতে বসাতে হবে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা যেন বিরক্ত না করে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করতে হবে।
- বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য জীবনভিত্তিক দৈনন্দিন কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে পাঠ ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যেতে পারে।
- এ ধরনের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আগ্রহী ও উৎসাহী বন্ধুদের সঙ্গে বসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- পড়াশুনায় ভালো এমন একজন শিক্ষার্থীর পাশে বসানো যেতে পারে; যাদের বিশেষ বন্ধু হিসেবে অভিহিত করা যায়। বছর শেষে ঐ বন্ধুকে পুরস্কৃত/ প্রশংসা করা যেতে পারে।
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ ও কথাবার্তা বলার সময় একই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সমার্থক শব্দ বলা উচিত নয়।
- শ্রেণিকক্ষে এ ধরনের শিক্ষার্থীর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে আস্তে আস্তে কথা বলা।
- পাঠদানে সময় সম্ভব হলে তাদেরকে ছবির পরিবর্তে বাস্তব উপকরণ যেমন- ফল, গাড়ি ইত্যাদি দেখানো।
- তাদেরকে জটিল প্রশ্ন না করা ও উত্তরের জন্য বেশি সময় দেয়া।
- শেখার জন্য তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা/ প্রশংসা করা ।
- শিখনের প্রতিটি সফলতার জন্য মূল্যায়ন করা এবং যথাযথভাবে তা রেকর্ড করা।
- অন্যান্য শিক্ষার্থীর তুলনায় তাকে বাড়ির কাজ কম দেয়া।/ তার সামর্থ্য বুঝে
- পড়ালেখার ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করা বা তাদের বাধ্য না করা।

❖ শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয়

একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর তুলনায় কম শ্রম ও স্বল্প পরিমাণ সহায়তার মাধ্যমে একীভূতকরণ সম্ভব। এক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্য চাহিদা ও প্রয়োজন হতে পারে-

- সমস্যা অনুযায়ী সহায়ক উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

- শ্রেণিকক্ষ/বিদ্যালয় ভবন, বিদ্যালয়ের মাঠ, টয়লেট, টিউবওয়েল ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা (দরজা প্রশস্ত করা, টয়লেট ও টিউবওয়েলে প্রবেশের জন্য প্রশস্ত র‍্যাম্প তৈরি করা ইত্যাদি)
- সম্ভব হলে শিক্ষার্থীর বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যালয়ে ভর্তি করা।
- শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরিবার ও সহপাঠী ও স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা দানের মনোভাব সৃষ্টি করা। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের বাড়ি কাছাকাছি হলে শিক্ষক নিজেও সহায়তা করতে পারেন।
- বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও সহপাঠ কার্যক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সমস্যার ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী খেলাধুলা ও কার্যক্রম নির্বাচন করা যাতে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে তারাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধিতার চাহিদা বিবেচনা করে তার উপযুক্ত স্থানে বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সাধারণ বেঞ্চ, চেয়ারের পরিবর্তে তার উপযোগী বিশেষ চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনমূলক শিক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োজনে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য নমনীয় মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা। যেমন- অন্য শিক্ষার্থী বোর্ডে গিয়ে লিখবে বা আঁকবে, একই কাজ সে তার সেলেটে বা খাতায় সম্পন্ন করে প্রদর্শনের সুযোগ পাবে।
- হাতের লেখা বা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে যদি সূক্ষ্মভাবে কাজটি করতে সমস্যা হয় অর্থাৎ দ্রুত করতে না পারে বা কলম পেন্সিল ধরতে সমস্যা হয় সে ক্ষেত্রে তাকে কম কাজ দেওয়া বা সময় বাড়িয়ে দেওয়া এবং কলম, পেন্সিল ধরার উপযোগী করে দেওয়া।
- সম্ভব হলে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে দরজার কাছাকাছি এবং দেয়াল বা বেড়ার সাইডে বসার সূযোগ দেওয়া। যাতে অন্য শিক্ষার্থীদের যাতায়াত পথে বাধার সৃষ্টি না হয় এবং শিক্ষার্থী তার সহায়ক উপকরণ নিরাপদ স্থানে রাখতে পারে।
- সহায়ক উপকরণ ব্যবহারকারী শিক্ষার্থী আছে এমন শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্রগুলো সারিবদ্ধভাবে থাকবে এবং চলাচলের পথ প্রশস্ত থাকবে যাতে শিক্ষার্থী তার সহায়ক উপকরণ নিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে।

❖ **অটিস্টিক শিক্ষার্থীকে শেখানোর নির্দেশনা বা নিয়ম যা অনুসরণীয়:**

- শিশুকে সহজভাবে গ্রহণ করা বা শিশুর বর্তমান অবস্থা মেনে ধৈর্যশীল, আন্তরিক এবং নিরপেক্ষ হওয়া;
- শিশুকে জানা এবং তার সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা;
- সঠিক বিষয়/লক্ষ্য নির্ধারণ;
- শিশুর উপযোগী নিরিবিলি পরিবেশ তৈরি করা;
- সঠিক উপকরণ আগে থেকে গুছিয়ে রাখা;
- যা করতে চাই তা শিশুকে বলা;
- সহজ ভাষায় সহজ করে নির্দেশনা দেয়া;
- শিশুকে বুঝতে, বোঝাতে, কাজ করতে এবং করাতে যথাযথ সময় দেয়া এবং নেয়া;
- শিশুকে সরাসরি কাজ করে না দিয়ে; বরং কাজ করতে সহায়তা করা;
- রুটিন অনুসরণ করা;
- শেখানোর জন্য এমন বিষয় বাছাই করা যাতে শিক্ষার্থী সেটা করতে সক্ষম বা সফল হয়;
- একই সাথে একাধিক বিষয় না শেখানো;

- শেখানোর সময় তাকে মৌখিকভাবে এবং সমর্থনসূচক আচরণের মাধ্যমে উৎসাহ দান;
- শিশু কাজটি করতে বা শিখতে পারলে তাকে পুরস্কার দেওয়া/ প্রশংসা করা;
- শিশুর ভুল কাজ ও অযৌক্তিক আচরণকে অনুমোদন না দেওয়া;
- শেখানোর সময় শিশুর আগ্রহ ও পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া;
- ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা;
- অন্যের বিরূপ সমালোচনা ও আচরণ থেকে শিশুকে রক্ষা করতে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান;
- শিশুর অগ্রগতি বা অবস্থা ডায়েরিতে সাপ্তাহিকভাবে লিখে রাখা।

একীভূত শিক্ষা: শিক্ষণ চ্যালেঞ্জ

না থাকলে যে কেউই শিখন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। এমনকি কোনো নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত না থাকলেও শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে; যেমন-

ভাষা ও যোগাযোগ চ্যালেঞ্জ

- মৌখিক যোগাযোগে অসুবিধা
- সীমিত শব্দভান্ডার
- সঠিক উচ্চারণে সমস্যা
- সাবলীলভাবে কথা বলতে বাধা (যেমন: তোতলামি)
- স্পষ্ট উচ্চারণ ও বাক্যগঠন করতে সমস্যা
- কথার অর্থ বুঝে যথাযথ প্রতিক্রিয়া দিতে অসুবিধা
- ভাষা বিকাশে চ্যালেঞ্জ এবং এর ফলে বুদ্ধিগত বিকাশে প্রভাব

সামাজিক ও আচরণগত চ্যালেঞ্জ

- খেলা বা দলে মিশতে অনাগ্রহ
- প্রত্যাশিত সামাজিক যোগাযোগে দুর্বলতা
- একই কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তির প্রবণতা
- বাড়ি–স্কুল–সমাজ—তিন পরিসরেই অতিরিক্ত চঞ্চল আচরণ
- দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে না পারা

মনোযোগ, নির্বাহী দক্ষতা ও নির্দেশনা-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ

- মনোযোগ ধরে রাখতে অসুবিধা
- জটিল/সূক্ষ্ম কাজে মনোযোগ কমে যাওয়া ও দীর্ঘ সময় ধরে কোন কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে না পারা।

- গুছিয়ে কাজ করার দক্ষতায় দুর্বলতা/ঘাটতি
- মৌখিক/লিখিত/ইশারা নির্দেশনা অনুসরণে অসুবিধা—বিশেষত বহু-ধাপযুক্ত নির্দেশনার ক্ষেত্রে
- শ্রেণিকক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে অসুবিধা ও অনাগ্রহ

সামাজিক-আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ চ্যালেঞ্জ

- আবেগ প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণে সমস্যা
- অনিয়ন্ত্রিত আচরণ/হতাশা ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা যেমন, সামান্য ভুল বা ব্যর্থতায় শিক্ষার্থী হঠাৎ রেগে যাওয়া, কান্না করা বা বই–খাতা ছুঁড়ে ফেলা; কাজ বুঝতে না পারলে বা শিক্ষক দেরিতে সাড়া দিলে অস্থির হয়ে উঠা এবং ক্লাসের মাঝেই কথা বলা বা আসন ছেড়ে উঠে পড়া; দলীয় কাজে নিজের মত না মানলে হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দেওয়া বা সহপাঠীর সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়া; অপেক্ষা করতে না পেরে অন্যের কথা কেটে দেওয়া বা পালা ভঙ্গ করা; শাসন বা সংশোধনমূলক নির্দেশ পেলে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, চুপ হয়ে যাওয়া বা ক্লাসে অংশগ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া।

ইন্দ্রিয়-সংবেদন সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ

- শ্রবণ-সংবেদনশীলতা বা শ্রবণদুর্বলতার কারণে অমনোযোগ ও অস্বস্তি
- পেছনের দিক থেকে আসা শব্দ শুনতে অসুবিধা
- দৃষ্টি–পেশি সমন্বয়ে সমস্যা

শারীরিক, মোটর ও দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ

- বয়সোপযোগী দৈনন্দিন জীবনদক্ষতায় সীমাবদ্ধতা
- পেশিগত বিকাশে ধীরগতি (হামাগুঁড়ি, হাঁটা, দৌড়ানো)
- শিক্ষাসামগ্রী ধরতে বা ব্যবহার করতে অসুবিধা (কলম/পেন্সিল ধরা, বইয়ের পাতা উল্টানো)
- হাতে-কলমে কাজ করতে অস্বস্তি
- পেশি-নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা
- বয়স অনুযায়ী বিকাশগত মাইলফলক অর্জনে বিলম্ব

শিক্ষণ চ্যালেঞ্জ

- পাঠের কোন বিষয় বুঝিয়ে দেয়ার পরও শিক্ষার্থীদের তা বুঝতে সময় লাগে। একই জিনিস বার বার প্রদর্শন করে দেখাতে হয় এবং শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য বেশি সময় দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
- কিছু শিক্ষার্থী দীর্ঘ সময় ধরে একটানা শিখনে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না, ফলে ক্লাস পরিচালনা ও শিখন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে।
- শিক্ষার্থীদের শিখন গতিতে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা থাকে; কেউ খুব দ্রুত শিখে, কেউ ধীরে, তাই সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা করা কঠিন হয়।

অস্থিতিশীল কর্মক্ষমতা চ্যালেঞ্জ

- কিছু দিন শিক্ষার্থী ভালোভাবে শিক্ষককে শ্রেণিপাঠদানে সাড়া প্রদান করে, আবার কিছুদিন সে নিস্ক্রিয় শিক্ষার্থী হিসেবে ক্লাশে বসে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন এক বা একাধিক প্রান্তিকে শিশুটির শিখন অগ্রগতি খুব ভালো, আবার অন্য প্রান্তিকে শিখন অগ্রগতি তেমন নেই।
- কিছু শিক্ষার্থী উৎসাহের অভাবে পাঠে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয় না, ফলে তাদের ধারাবাহিক শিখন অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।
- বাড়ি বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, যেমন বিশৃঙ্খল বা অশান্ত পরিবেশ, শিক্ষার্থীর ক্লাসে মনোযোগ ও পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অস্বাভাবিক আচরণ চ্যালেঞ্জ

- শ্রেণিকক্ষে বারবার নড়াচড়া করা, অতিরিক্ত কথা বলা, কোথাও স্থিরভাবে বসে থাকার অসুবিধা।
- কিছু শিক্ষার্থীর অস্বাভাবিক আচরণ অন্য শিক্ষার্থীর মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, যা সমগ্র ক্লাসের শিখন পরিবেশকে প্রভাবিত করে।
- ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতা বা আচরণগত অশান্তি শিক্ষককে পাঠের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বাধা দেয় এবং শিশুর নিজের ও সহপাঠীর শিখন অগ্রগতিকে বিলম্বিত করে।

নির্দেশনা প্রক্রিয়া করতে চ্যালেঞ্জ

- শিক্ষক কোন শ্রেণি কাজের নির্দেশনা দিলে তা বুঝতে না পারা, কাজ ভুলে যাওয়া বা ভুলে অন্য কাজ করা।
- শিক্ষার্থীরা একাধিক ধাপের নির্দেশনা একসাথে মনে রাখতে পারে না, ফলে কাজ সম্পন্ন করতে সমস্যা হয়।
- কিছু শিক্ষার্থী নির্দেশনার সময় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়, ফলে কাজ শুরু করলেও তা সঠিকভাবে শেষ করতে পারে না।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা চ্যালেঞ্জ

- দলীয় কার্যক্রম (শ্রেণি কাজ ও খেলা) এবং অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা এড়িয়ে চলা।
- শিক্ষার্থী তার মতামত, ধারণা বা অনুভূতি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করতে কষ্ট পায়, ফলে ক্লাসে অংশগ্রহণ কমে।
- নতুন বা অপরিচিত সহপাঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে দ্বিধা, যা সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও দলগত শিখনে বাধা সৃষ্টি করে।

বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ

- **শ্রেণিকক্ষে প্রবেশগম্যতাজনিত চ্যালেঞ্জ:** বিদ্যালয়ে, শ্রেণিকক্ষে ও ওয়াশরুমে হুইল চেয়ার নিয়ে প্রবেশের জন্য পর্যাপ্ত র‍্যাম্প নেই। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোতে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এসকল বহুতল বিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবনে লিফট না থাকায় উপরের তলার শ্রেণিকক্ষগুলো শারীরিক ও মানসিক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ব্যবহার অনুপোযোগী।/ কিছু কিছু শিক্ষার্থীর প্রবেশগম্যতার জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়।

- **শ্রেণিকক্ষের গঠন সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ:** বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের পরিমাপ বড় এবং চওড়া হওয়া উচিত। যা শিক্ষার্থীদের সাবলীলভাবে চলাচল করা, দলীয় কাজ করার জন্য উপযুক্ত নয়। বিশেষ করে হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী শারীরিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে অবস্থান ও চলাচল খুবই কষ্টকর।
- **শিখন সহায়ক আসবাবপত্র সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ:** শ্রেণিকক্ষে একই সাইজের বেঞ্চে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী বসে । তাদের উচ্চতা ও বৈচিত্র্য বিবেচনায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বসার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় শ্রেণিকক্ষে আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে।
- **শিখনবান্ধব শ্রেণিকক্ষের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ:** শিখন**বান্ধ**ব শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ বলতে শ্রেণিকক্ষের এমন পরিবেশ বুঝায় যেখানে শিশুরা সহজে, সাগ্রহে ও সুরক্ষিত থেকে আনন্দের সাথে শিখতে পারে। শ্রেণিকক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষের প্রবেশ পথ হবে সাজানো গোছানো, উজ্জল রংয়ে অংকন ও সৃজনশীল কাজে পরিপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষ হতে হবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। আসন বিন্যাস এমন হতে হবে যাতে শিশুরা সহজে আসা যাওয়া করতে পারে। চক বোর্ড বেশি **উঁচুতে/উচ্চতায়** হবে না, যাতে শিশুরা বোর্ডে সাবলীলভাবে লিখতে পারে। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলো ও ফ্যানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিশুদের বৈচিত্র্য বিবেচনায় শ্রেণিকক্ষে অডিও ভিজুয়াল সিস্টেমসহ পর্যাপ্ত শিখন সামগ্রী থাকতে হবে।
- **শিখন সহায়ক উপকরণগত চ্যালেঞ্জ:** একটি পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষক যে ধরণের শিখন সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন, একীভূত শিক্ষায় ঠিক একই ধরণের উপকরণ ব্যবহার করবেন। তবে উপকরণসমূহ সকল শিক্ষার্থীর বিশেষ করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (মেধা, বয়স, প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি বিবেচনায়) প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা প্রয়োজন। একীভূত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর শিখনকে ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। শিশুদের বৈচিত্র্য ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষণ উপকরণ থাকা উচিত । এর মধ্যে আছে-
    - ✓ দর্শনভিত্তিক উপকরণ (Visual Aids): যেমন – চার্ট, ছবি, ডায়াগ্রাম, পোস্টার ইত্যাদি।
    - ✓ শ্রবণভিত্তিক উপকরণ (Auditory Aids): যেমন – অডিও রেকর্ডিং, গান, কথোপকথন
    - ✓ শ্রবণ- দর্শনভিত্তিক উপকরণ (Audio-Visual Aids): যেমন – ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন বা প্রজেক্টর সাপোর্ট ।
    - ✓ কর্ম-সম্পাদনমূলক উপকরণ (Activity Based Aids): যেমন – হাতের কাজের উপকরণ, মডেল, খেলাধুলাভিত্তিক শিক্ষাসামগ্রী
    - ✓ অনুসন্ধানমূলক শিক্ষাউপকরণ (Explorative Aids): যেমন –ল্যাব সরঞ্জাম, প্রাকৃতিক উপকরণ, ধাঁধা, ব্লক, বিজ্ঞান-ভিত্তিক খেলনা

বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে বেশিরভাগ উপকরণের অভাব রয়েছে। তবে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ বিবেচনায় নিয়ে কোন সুনির্দিস্ট পাঠের শিখনফল অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় উপকরণ শিক্ষক স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প/বিনা বাজেটে (low cost & no cost) প্রস্তুত করতে পারেন। তাই শিক্ষককে এই বিষয়ে উদ্যমী ও আগ্রহী হতে হবে।

শিখন চ্যালেঞ্জ

শ্রেণিকক্ষে সব শিক্ষার্থী একইভাবে বা একই গতিতে কাজ করতে পারে এমন প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। কেউ দ্রুত শেখে, কেউ সময় ও সামান্য সহায়তা পেলে শিখতে পারে, আবার কারো তুলনামূলক বেশি নির্দেশনা প্রয়োজন হয়। প্রতিটি ক্লাসেই এমন ভিন্ন ভিন্ন সক্ষমতার শিক্ষার্থী থাকে-প্রতিবন্ধিতা থাকুক বা না থাকুক।

এই বাস্তবতায় একই মানদণ্ডে সব শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করলে তাদের প্রকৃত অগ্রগতি ধরা পড়ে না। অনেক সময় যে শিক্ষার্থীকে "দুর্বল" মনে হয়, উপযুক্ত সময় ও সহায়তা পেলে তার অগ্রগতি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সমান বা বেশি হতে পারে। শিক্ষার্থীর উপযোগী পরিবেশ, কৌশল ও উপকরণ

একীভূত শিক্ষা: শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর শিখনফল নিশ্চিত করতে শুধু পাঠ পরিকল্পনা নয়, বরং দক্ষ ও ফলপ্রসূ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনাই প্রধান ভিত্তি। কারণ দুর্বল ব্যবস্থাপনায় ভালো পাঠও কাঙ্ক্ষিত শিখনফল দেয় না। তাই শ্রেণিকক্ষে শিখন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিক্ষক যে কৌশল ব্যবহার করেন, সেটাই শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা।

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য–

- শিখন কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা।
- পাঠ-সম্পর্কিত কার্যক্রম ও উপকরণ আগেই প্রস্তুত রাখা।
- শিখন-শেখানোর ধাপগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করা।
- ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখা।
- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ গড়ে তোলা।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখা।
- শ্রেণি কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও শিখন লক্ষ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট সংযোগ স্থাপন করা।
- শিক্ষার্থীদের শিখনধারার ভিন্নতা বোঝা।
- প্রতিবন্ধিতা-জনিত বৈচিত্র্যতা চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।
- আচরণগত ভিন্নতাকে সম্মান করে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়া।
- জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল থেকে বৈষম্যহীন পরিবেশ বজায় রাখা।
- ভাষাগত পার্থক্যকে স্বীকার করে যথাযথ সহায়তা দেওয়া।
- সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় রাখা।

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল

শিক্ষার্থীর শিখন বৈচিত্রতা: শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর শিখন ধরন আলাদা- গতানুগতিক শিখন- শেখানো প্রক্রিয়াই প্রয়োগ করা হলে সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়। তাই শিক্ষকের শিক্ষার্থীর বৈচিত্রতা সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা।

শিক্ষার্থীদের কাজে অমনোযোগী: শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কাজ না করা এবং দলগত কাজে অনীহা দেখানো। এক্ষেত্রে শিক্ষক যা করতে পারেন- সহজ ভাষায় নির্দেশনা দেওয়া, বারবার কাছে গিয়ে নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত করা, ছোট ছোট ধাপে কাজ করানো, বারবার অনুশীলন করানো, ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা।

ইশারা ভাষা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা: ইশারা ভাষা সম্পর্কে ধারণা কম বা না থাকলে, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে পারে না। তাই শিক্ষকের ইশারা ভাষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী: শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মনোযোগের অভাব, নির্দেশনা অনুসরণে অসমর্থ, একাকী থাকতে পছন্দ করে। তাই শিক্ষক শ্রবণের বিকল্প উপায় ব্যবহার করতে পারেন যেন, না শুনলেও বিষয়বস্তু বুঝতে পারে। যেমন- ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী: এধরনের শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, ভাষাজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ক দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়ন ধীত গতিতে হয়। এরা নির্দেশনা বুঝতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এদের জন্য শিক্ষক সহজ ভাষায় নির্দেশনা দিতে পারেন, বিমূর্ত বিষয় না বুঝিয়ে বাস্তব উপকরণের সাহায্যে বোঝাতে পারেন, ছোট ছোট ধাপে কাজ করাতে পারেন, এবং বেশি বেশি অনুশীলন করাতে পারেন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী: দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। যেমন- ক্ষীণ দৃষ্টি, আংশিক দৃষ্টি। চোখ ঢেকে রাখা বা চোখ কুচকে দেখার চেষ্টা করা। এসকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষক বিকল্প উপায়ে ক্ষীণ দৃষ্টি, আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করা। যেমন- মৌখিক যোগাযোগ ও বিষয়বস্তু মুখে বর্ণনা করা ও শোনানো। ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর কাছাকাছি থেকে দেখার সুযোগ দেওয়া। অডিও রেকর্ড বা লিখিত বর্ণনা যা অন্যরা পড়ে শোনাতে পারে। শ্রুতি লেখকের সহায়তা নেওয়া। এছাড়াও ব্রেইল পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া।

শিখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী: এ সকল শিক্ষার্থী একই শব্দ বারবার পড়া বা লেখা, শব্দ বা প্রতীক উল্টো করে লেখা, সমবয়সীদের তুলনায় অনগ্রসর হয়, এবং অপ্রাসঙ্গিক কাজে মনোযোগ হয়ে থাকে। তাই তাদের জন্য শিক্ষক সহজ ছবি ও উপকরণের সাহায্যে নির্দেশনা দিতে পারেন, পিয়ার দল (সমবয়সী) ও শিক্ষকের কাছ থেকে সহায়তা সুযোগ তৈরি করতে পারেন।
শিক্ষার্থীর ভাষাগত ভিন্নতা: যে সকল শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা ভিন্ন, তাদের ক্ষেত্রে এ-ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষক তাদের মাতৃভাষায় (তার কাছে গিয়ে) বুঝিয়ে দিতে পারেন।

খেলাধুলা ও খেলার মাধ্যমে শেখানো: শিক্ষার্থীদের শেখানোকে খেলায় রূপ দেওয়া। যেমন-পাজল, বোর্ডগেম, রোল-প্লে বা সাজানো নাটক ইত্যাদি ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থী মজা পাবে এবং মনোযোগী হবে।

ছোট ছোট ভাগে শেখানো: বড় বিষয়কে ছোট, সহজ অংশে ভাগ করা। শিক্ষার্থীদের একটানা বেশি সময় মনোযোগ রাখা কঠিন হয়। তাই শিক্ষক প্রতিটি পাঠকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে শেখালো, সহজে শিখে যাবে।

পরিবেশকে শিক্ষার অংশ করা: বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পাঠের সাথে মিলিয়ে পাঠ উপস্থাপনা করা। যেমন- যে পাঠের সাথে বিদ্যালয়ের পরিবেশের কোন উপাদানকে মিলানো যায়, প্রকৃতি ভ্রমণ, মাঠে ক্লাস ইত্যাদি বাস্তব জিনিস দেখে শেখা হয়।

ইতিবাচক শিখন পরিবেশ: ইতিবাচক শিখন পরিবেশ হলো এমন একটি সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি যেখানে শিক্ষার্থীরা নিরাপদ, আত্মবিশ্বাসী, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসী, ভয়হীন যোগাযোগ, উৎসাহমূলক এবং সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশে নিজের দক্ষতা ও জ্ঞান বিকাশ করার সুযোগ পায়।

শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জিং আচরণ: শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জিং আচরণ হলো এমন আচরণ যা নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম, অন্যান্য শিক্ষার্থীর শেখা বা নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশকে ব্যাহত করে। যেমন: ক্রমাগত কথা বলা, বিরক্ত করা, নির্দেশ অমান্য করা বা কাজে অসহযোগিতা, রাগ বা আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখানো, মনোযোগ না দেওয়া, একঘেয়েমি প্রকাশ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জিং আচরণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ-

ক) শাস্তি (Punishment)

খ) অন্যের সঙ্গে তুলনা করা (Compare with others)

গ) নেতিবাচক তকমা দেওয়া (Labeling)

ঘ) অভিযোগ করা (Complain)

ক. শাস্তি (Punishment):

শাস্তি, তা শারীরিক হোক বা মানসিক, কখনোই কার্যকর শিক্ষণ কৌশল নয়। আপাতদৃষ্টিতে শাস্তি কোনো শিক্ষার্থীর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে পারলেও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব শিক্ষার্থী এবং তার আশেপাশের মানুষদের ওপর নেতিবাচক হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, যারা শাস্তির শিকার হয়, তাদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে আক্রমণাত্মক আচরণ করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

খ. অন্যের সঙ্গে তুলনা করা (Compare with others)

কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখা দিলে, শিক্ষকেরা তাদের সেই আচরণ প্রত্যাশিত আচরণ করা অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এই পদ্ধতিতে, শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের সেই অন্য শিক্ষার্থীদের মতো করে কাজ করতে বা কথা বলতে বলেন। কিন্তু এই ধরনের তুলনা শিক্ষার্থীদের জন্য অপমানজনক হতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস কমে যেতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে তাদের অপ্রত্যাশিত আচরণ আরও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

গ. নেতিবাচক তকমা দেওয়া (Labeling)

অনেক সময় অপ্রত্যাশিত আচরণ করা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন নেতিবাচক নামে (যেমন: দুষ্ট, বেয়াদব, কথা শোনে না, অভদ্র, বোকা, অসামাজিক) চিহ্নিত করা হয়, যা তাদের থেকে ভালো আচরণ প্রত্যাশার একটি ভুল কৌশল। এই ধরনের নামকরণ শিক্ষার্থীদের সামাজিক সম্পর্ক গঠনে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, এবং ভালো আচরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে না। বিশেষ করে, যখন অন্য কেউ, যেমন শিক্ষক, অভিভাবক, বা সহপাঠীদের সামনে শিক্ষার্থীদের এই ধরনের নামে ডাকা হয়, তখন তা তাদের সামগ্রিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঘ. অভিযোগ করা (Complain)

শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আচরণ নিয়ে অন্য শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক বা অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। প্রায়শই, এই ধরনের অভিযোগের কারণে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়, তারা অপমানিত বোধ করে এবং শাস্তির সম্মুখীন হয়। ।

শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা সমাধানে অন্য শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক বা অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে, এই আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ওপর যেন কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনাটি গোপনীয়ভাবে এবং সংবেদনশীলতার সাথে পরিচালনা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়।
শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত:

- শিক্ষার্থীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা।
- শিক্ষার্থীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা চাওয়া।
- সমস্যার কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা।
- সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করা।

শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জিং আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশল

ক) রিইনফোর্সমেন্ট (Reinforcement)
খ) নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা (Establishment of Rules)
গ) প্রত্যাশিত আচরণ কেমন হবে তা দেখানো (Modeling)
ঘ) প্রত্যাশিত আচরণে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রশংসা করা (Praise)
ঙ) অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে যাওয়া (Ignore)
চ) প্রত্যাশিত আচরণের দিকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া (Redirect)

ক. রিইনফোর্সমেন্ট (Reinforcement)

শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত আচরণকে উৎসাহ দেওয়া এবং শ্রেণিকাজের জন্য ক্ষতিকর আচরণকে পরিবর্তন করার কৌশলই হলো 'রিইনফোর্সমেন্ট'। যখন একজন শিক্ষার্থী ভালো আচরণ করে, তখন তাকে এমনভাবে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে সে এবং অন্যরাও ভবিষ্যতে একই আচরণ করতে উৎসাহিত হয়। অন্যদিকে, শ্রেণিকাজের জন্য ক্ষতিকর আচরণগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শেখে। শ্রেণিকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, শিক্ষার্থীর কোন আচরণটি কাঙ্ক্ষিত এবং কোনটি ক্ষতিকর, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী রিইনফোর্সমেন্ট প্রদান করা জরুরি। যেমন,

- প্রশংসা: 'তুমি খুব ভালো ভাবে অঙ্কটা করেছ!' বা 'আজকে ক্লাসে তোমার আচরণ খুব ভালো ছিল।'
- পুরস্কার: ভালো কাজের জন্য স্টিকার, খাতায় গুড, ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট লেখা, স্টার দেওয়া, চকলেটবা ছোট উপহার দেওয়া।
- বিশেষ সুবিধা: ভালো কাজের জন্য অতিরিক্ত খেলার সময় বা পছন্দের কাজ করার সুযোগ দেওয়া।
- সামাজিক স্বীকৃতি: ক্লাসে ভালো কাজের জন্য হাততালি দেওয়া বা সবার সামনে প্রশংসা করা।
- পজিটিভ ফিডব্যাক: 'তোমার লেখার উন্নতি হচ্ছে, এভাবে চালিয়ে যাও।'

খ. নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা (Establishment of Rules)

শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে, তা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিবার সেই নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। নিয়ম সব শিক্ষার্থীদের জন্য একই হতে হবে। নিয়ম মনে করিয়ে দেবার কাজটিও আলাদাভাবে নির্দিষ্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নয়, বরং ক্লাসের সবাইকে উদ্দেশ্য করে একসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে হবে। প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে, তা মৌখিক, ছবি, ইশারা এবং পোস্টারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে, যাতে সব ধরনের শিক্ষার্থী নিয়মের বিষয়টি সমানভাবে বুঝতে পারে।

উদাহরণ: শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে কিছু নিয়ম তৈরি করলেন:

১. ক্লাসে প্রবেশের পর সবাই নিজ নিজ আসনে বসবে।

২. শিক্ষক কথা বলার সময় সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

৩. কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

৪. ক্লাসে চিৎকার বা হইচই করা যাবে না।

৫. শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে।

গ. প্রত্যাশিত আচরণ কেমন হবে তা দেখানো (Modeling)

শিক্ষার্থীর সামনে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি এমনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে সে তা অনুকরণ করে শিখতে পারে, শ্রেণিকক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। নিচে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

উদাহরণ ১: শ্রেণিকক্ষে হাত তোলার নিয়ম শেখানো

- শিক্ষক ক্লাসে হাত তুলে কথা বলার নিয়ম শেখাতে চান।
- তিনি নিজে হাত তুলে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন এবং উত্তর দেওয়ার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে ডাকবেন।
- শিক্ষক একটি পোস্টার ব্যবহার করতে পারেন, যেখানে হাত তোলার সঠিক নিয়ম দেখানো হয়েছে।
- শিক্ষক একটি ভিডিও দেখাতে পারেন, যেখানে শিক্ষার্থীরা হাত তুলে কথা বলছে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের রোল প্লে করতে বলতে পারেন, যেখানে তারা হাত তুলে কথা বলার অনুশীলন করবে।

ঘ. প্রত্যাশিত আচরণে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রশংসা করা (Praise)

শিক্ষার্থী যখন কোনো কাঙ্ক্ষিত আচরণ (অল্প সময়ের জন্যও) করে, তখন তাকে মনোযোগ দেওয়া এবং আচরণটি উল্লেখ করে প্রশংসা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শিশু ক্লাসে চুপচাপ বসে শিক্ষকের কথা শোনে, তবে শিক্ষক বলতে পারেন, 'সুমনা, তুমি খুব শান্ত হয়ে বসে আছো, এটা খুব ভালো।' অথবা, 'রাকিব, তুমি মনোযোগ দিয়ে কাজ করছো, এটাতে আমি খুশি হয়েছি।'

যখন কোনো শিক্ষার্থী অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে, তখন অন্য যে শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত আচরণ করছে, তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং কাজটি উল্লেখ করে প্রশংসা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী কথা বলে বিঘ্ন ঘটায়, তবে শিক্ষক বলতে পারেন, 'দেখো, তামান্না কত সুন্দর করে তার কাজ শেষ করছে।' অথবা, 'সাকিব, তুমি খুব শান্ত হয়ে নিজের কাজ করছো, এটা ভালো।'

ঙ. অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে যাওয়া (Ignore)

যদি কোনো শিক্ষার্থী এমন আচরণ করে যা উপেক্ষা করলে বা গুরুত্ব না দিলে শ্রেণিকার্যক্রমে তেমন কোনো প্রভাব পরবে না অথবা শিক্ষার্থী অল্প সময়ের মধ্যেই নিজে থেকে শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করবে, তবে সেই আচরণ এড়িয়ে যাওয়া উচিত। শিক্ষকের মনোযোগ না পাওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর অপ্রত্যাশিত আচরণ করার আগ্রহ কমে যায়।

উদাহরণ:

১. অল্প সময়ের জন্য ফিসফিস করা: ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থী যদি কয়েক সেকেন্ডের জন্য অন্য শিক্ষার্থীর সাথে ফিসফিস করে, যা শ্রেণিকার্যক্রমে তেমন কোনো ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না, তবে শিক্ষকের উচিত এই আচরণটি উপেক্ষা করা। অতিরিক্ত মনোযোগ না দিলে, শিক্ষার্থী অল্প সময়ের মধ্যেই নিজে থেকে ক্লাসের কাজে মনোযোগী হবে।

২. অল্প সময়ের জন্য হাই তোলা: ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থী যদি অল্প সময়ের জন্য হাই তোলে, তবে শিক্ষকের উচিত এই আচরণটি উপেক্ষা করা। যদি শিক্ষক এই আচরণে অতিরিক্ত মনোযোগ দেন, তবে শিক্ষার্থী বিব্রত বোধ করতে পারে এবং ক্লাসে মনোযোগী হতে নিরুৎসাহিত বোধ করতে পারে।

চ. প্রত্যাশিত আচরণের দিকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া (Redirect)

যখন কোনো শিক্ষার্থী অপ্রত্যাশিত আচরণ করে, তখন সেই আচরণের দিকে সরাসরি মনোযোগ না দিয়ে তার মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাসের সময় যদি দুজন শিক্ষার্থী দীর্ঘক্ষণ ধরে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে, তবে শিক্ষক ক্লাসের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য একটি সাধারণ নির্দেশ দিতে পারেন, যেমন: 'সবাই বাংলা বইয়ের ১০ নম্বর পৃষ্ঠা খোলো।' এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কাঙ্ক্ষিত কাজের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের আচরণ করে থাকে, তবে সব আচরণের বিশ্লেষণ করা বা সেগুলোর জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র সেই আচরণগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, যেগুলো শিক্ষার্থীর নিজের বা অন্যদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এ ধরনের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি পর্যায়ে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে:

ক. আচরণ ঘটার পূর্বে

খ. আচরণ ঘটার সময়ে

গ. আচরণ ঘটে যাওয়ার পরে

ক. অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার আগেই কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে:

- শ্রেণিকক্ষে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা: শিক্ষার্থীদের জন্য সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম তৈরি করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তাদের নিয়মগুলো মনে করিয়ে দিতে হবে।
- দৃশ্যমান উদাহরণ: অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার আগেই ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শন করা সম্পর্কে মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- ইতিবাচক উদ্দীপনা: ভালো আচরণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা ও পুরস্কার প্রদান করতে হবে।
- বিরতি: পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট ছোট বিরতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- পছন্দের কাজ: প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দের কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, যা তাদের মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

খ. অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার সময় কিছু কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন:

- এড়িয়ে চলা (Ignore): মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে চলা ভালো, যদি তা শিক্ষার্থী বা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর না হয়।
- কাজ মনে করিয়ে দেওয়া (Redirect): শিক্ষার্থী খারাপ আচরণ করলে, তাকে সরাসরি কিছু না বলে তার কাজের কথা মনে করিয়ে দিন। যেমন, ক্লাসের সময় কথা বললে, তাকে চুপ করতে না বলে কাজের কথা বলুন।
- প্রশংসা করা (Praise): ভালো আচরণের জন্য প্রশংসা করুন। শিক্ষার্থী অল্প সময়ের জন্যও ভালো আচরণ করলে, তার প্রশংসা করুন। খারাপ আচরণ করা শিক্ষার্থীর বদলে, ভালো আচরণ করা শিক্ষার্থীর প্রশংসা করুন।

গ. অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার পর যেসব কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে:

- সবার উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি জানানো: এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করে বা শিক্ষার্থীদের সরাসরি লক্ষ্য করে কথাটি না বলা হয়। এমনভাবে মনে করিয়ে দিতে হবে যে সকল শিক্ষার্থী বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারে।
- ছবির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি দেখানো: ছবি ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি দৃশ্যমান করা যেতে পারে বা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে

- খেলার মাধ্যেম আচরণ ব্যবস্থাপনা: যেমন, ফ্রিজ (Freeze) ফ্রিজ খেলা, দূরবিন খেলা, ছন্দে তালি খেলা, চোখ বন্ধ-খোলা খেলা ইত্যাদি।

ফ্রিজ (Freeze) ফ্রিজ খেলা:

- শিক্ষার্থীদের গোল করে দাঁড় করিয়ে বলুন, "আজ আমরা ফ্রিজ ফ্রিজ খেলব।"
- বলুন, "আমি যখন 'লাফাও, লাফাও' বলব, সবাই দুই পায়ে লাফাবে। আর যখন 'ফ্রিজ' বলব, সবাই যেখানে আছ সেখানেই থেমে যাবে। নড়াচড়া বা কথা বলা যাবে না, শিক্ষকের দিকে তাকাতে হবে।"
- শিক্ষার্থীদের সাথে লাফাতে লাফাতে বলুন, "লাফাও, লাফাও..."। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে বলুন, "ফ্রিজ!" দেখুন, শিক্ষার্থীরা থামে কিনা। যারা দ্রুত থামবে, তাদের প্রশংসা করুন।
- কয়েকবার খেলাটি খেলুন। দেখবেন, শিক্ষার্থীরা 'ফ্রিজ' শব্দের সাথে পরিচিত হয়ে তাদের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে এবং মনোযোগী হবে।

দূরবিন খেলা

- শিক্ষার্থীদের গোল হয়ে দাঁড় করিয়ে বলুন, "আজ আমরা দূরবিন দিয়ে দেখব।"
- বলুন, "প্রথমে এক হাতের আঙুলগুলো ভাঁজ করে নাকের সামনে একটা গোল বানাই। এবার অন্য হাতের আঙুলগুলোও একইভাবে গোল বানাই। এবার দুই হাতের গোল দুটি চোখের সামনে ধরো। এটা হলো আমাদের দূরবিন।"
- শিক্ষার্থীদের বলুন, "এবার এই দূরবিন দিয়ে আমরা কী কী দেখতে পাচ্ছি, সেটা বলি।" কয়েকজনের কথা শুনুন।
- ক্লাসের ভেতরে বা বাইরে কোথাও এই খেলাটি খেলতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা আপনার প্রতি মনোযোগী হবে।

ছন্দে তালি খেলা

শিক্ষার্থীদের গোল করে দাঁড় করিয়ে তালি দিয়ে ছন্দে কথা বলুন। যেমন:

- একবার তালি দিয়ে বলুন: "এখন!"
- দুইবার তালি দিয়ে বলুন: "খেলার সময়!"
- তিনবার তালি দিয়ে বলুন: "মজা করি!"

এবার তালির সাথে ছন্দের একটা নিয়ম তৈরি করুন। যেমন:

- একবার তালি: "এক"
- দুইবার তালি: "এক-দুই"
- তিনবার তালি: "এক-দুই-তিন"

এই নিয়মে শিক্ষার্থীদের সাথে খেলাটি খেলুন।

পরে অন্য শব্দ ব্যবহার করেও একই নিয়মে খেলাটি খেলতে পারেন।

চোখ বন্ধ-খোলা খেলা

- শিক্ষার্থীদের গোল করে দাঁড় করিয়ে বলুন, ‘আজ আমরা চোখ বন্ধ-খোলার একটা মজার খেলা খেলব।’
- বলুন, ‘আমি একবার তালি দিয়ে 'চোখ বন্ধ' বললে তোমরা চোখ বন্ধ করবে। আর দুইবার তালি দিয়ে 'চোখ খোলো' বললে চোখ খুলবে।’
- শিক্ষার্থীদের সাথে খেলাটি খেলুন। তারা তালি শুনে চোখ বন্ধ-খুলতে পারলে প্রশংসা করুন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে কয়েকবার খেলাটি খেলুন।

একীভূত শিক্ষায় মূল্যায়ন কৌশল

লিডিং প্রশ্ন: বিদ্যালয় পর্যায়ে মূল্যায়ন করার প্রধান লক্ষ্য কী? প্রচলিত মূল্যায়ন চর্চা আসলে কী মূল্যায়নের উদ্দেশ্য পূরণ করে?

একীভূত শিক্ষায় মূল্যায়ন

একীভূত শিক্ষার আলোকে মূল্যায়ন হলো এমন একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি, যেখানে সব ধরনের শিক্ষার্থী—বয়স, শিখন চাহিদা, দক্ষতার স্তর, প্রতিবন্ধিতা, জেন্ডার, ভাষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য কিংবা বিশেষ মেধা—সব বিবেচনায় নিয়ে প্রশ্ন, কাজ ও পরীক্ষার পরিবেশ তৈরি করা হয়, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ন্যায্য ও সমান সুযোগে নিজের শিখন প্রদর্শন করতে পারে।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্যসমূহ যেমন-

- শিক্ষার্থীর সামগ্রিক শিখন দক্ষতা উন্নয়ন করা।
- শিখন প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকর করে তোলার জন্য বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের জন্য ফিডব্যাক সংগ্রহ করা।
- শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ।
- শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

একীভূত শিক্ষার মূল্যায়ন কৌশল

১। বহুবিধ মূল্যায়ন (Multi-modal Assessment)

- ভিজ্যুয়াল, মৌখিক, হাতে-কলমে কাজ-শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিকল্প পথ।
- একই দক্ষতা-ভিন্ন উপায়ে প্রকাশের সুযোগ।

২। ধারাবাহিক ও গঠনমূলক মূল্যায়ন

- পরীক্ষা নয়, শিখন-অগ্রগতি ট্র্যাক করা।
- তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক।
- ছোট ছোট চেকপয়েন্ট, একক বড় পরীক্ষার ওপর নির্ভরতা না রাখা।

৩। দক্ষতা-ভিত্তিক মূল্যায়ন

- শুধু লিখিত পারদর্শিতা নয় কাজের মাধ্যমে দক্ষতা পরিমাপ। যেমন- প্রকল্প, দলীয় কাজ, প্রদর্শনী, বাস্তব সমস্যা সমাধান ইত্যাদি

৪। ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানদণ্ড (Criterion-referenced)

- শিক্ষার্থীর তুলনা শিক্ষার্থীর সাথে নয়-নিজের অগ্রগতি বনাম নিজের লক্ষ্যমাত্রা সাথে তুলনা করা।
- বৈচিত্র্যময় শিখনগতিকে সম্মান করা।

৫। সহায়ক ব্যবস্থা যুক্ত মূল্যায়ন

কিছু শিক্ষার্থীর জন্য সাপোর্টই সমতা তৈরি করে।

✓ অতিরিক্ত সময়

✓ বড় ফন্ট/সহায়ক প্রযুক্তি

✓ পাঠক/লেখক সহায়তা

✓ বিকল্প কাজের ফরম্যাট

৬। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা বিবেচনায় মূল্যায়ন

মূল্যায়ন যেন কারও ভাষা বা সাংস্কৃতিক অভ্যাসকে বাধা বানিয়ে না ফেলে।

✓ সরল ও স্পষ্ট ভাষা

✓ সাংস্কৃতিকভাবে নিরপেক্ষ উদাহরণ

৭। স্ব-মূল্যায়ন ও সহ-মূল্যায়ন

✓ নিজের শেখা মূল্যায়ন

✓ সহপাঠী মূল্যায়ন—দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতা বাড়ায়

৮। বহুমাত্রিক পদ্ধতির মূল্যায়ন

- মৌখিক, লিখিত, ব্যবহারিক, পর্যবেক্ষণ, প্রজেক্ট, জোড়ায়/দলগত কাজ, আঁকন, আলোচনা—বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার।
- লিখিত মূল্যায়নই একমাত্র পদ্ধতি—এই ভুল ধারণা এড়ানো।
- ডিজিটাল টুল ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি।

৯। বিষয়ভিত্তিক সমান গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন

- প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয় সমান গুরুত্বে মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।
- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, শিল্পকলা, সংগীত, পরিবেশ, নৈতিক শিক্ষা—কোনো বিষয় যেন উপেক্ষিত না হয়।
- শিক্ষার্থীরা যে বিষয়ে দক্ষ, সে ক্ষেত্রেও মূল্যায়নের সুযোগ থাকা আবশ্যক।

১০। শিখনক্ষেত্রভিত্তিক মূল্যায়ন

- বিষয় অনুযায়ী নির্ধারিত শিখনক্ষেত্র (Listening–Speaking–Reading–Writing, Scientific skills, Values ইত্যাদি) প্রশ্ন প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত করা।
- একই বিষয়ে একমাত্রিক প্রশ্ন না দিয়ে শিখনের সব উপাদান কাভার করা।

১১। প্রতিবন্ধকতা ও বৈচিত্র্যভিত্তিক অভিযোজন অনুযায়ী মূল্যায়ন

- শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা ও অতি মেধাবী শিক্ষার্থী—সবার জন্য প্রশ্নের জটিলতা ও ফরম্যাট অভিযোজিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী *বিকল্প প্রশ্ন, সহায়ক উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি, বড় অক্ষরের প্রশ্নপত্র* ইত্যাদি রাখা।
- লিখন-দুর্বল শিক্ষার্থীর জন্য শ্রুতি লেখক বা বিকল্প ব্যবস্থা।
- মাতৃভাষাভিত্তিক মূল্যায়ন বিশেষ করে নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা (ইংরেজি ছাড়া)।

১২। নমনীয় সময় ব্যবস্থাপনাভিত্তিক মূল্যায়ন

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য অতিরিক্ত সময় প্রদান।
- একই সময়সীমা সব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তা ইনক্লুসিভ হয় না।
- বিশেষ পরিস্থিতি (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পারিবারিক/সামাজিক সংকট) মোকাবেলায় *বিকল্প সময় ও পুনর্মূল্যায়ন সুযোগ* রাখা।

১৩। সংবেদনশীল মূল্যায়ন

- কোনো ধর্ম, লিঙ্গ, পেশা, গোষ্ঠী বা সামাজিক চর্চা—কোনো কিছুকে অবমাননা, পক্ষপাত বা বৈষম্যমূলকভাবে উপস্থাপন না করা।
- শিক্ষার্থীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নিরাপদ বিষয়বস্তু ব্যবহার।

১৪। অন্তর্ভুক্তিমূলক মার্কিং গাইডলাইনভিত্তিক মূল্যায়ন

- উত্তরপত্র মূল্যায়নের আগে অভিন্ন, বৈষম্যহীন মার্কিং গাইডলাইন তৈরি।
- নম্বর প্রদানে পক্ষপাত বা বৈষম্য কমানোর জন্য স্পষ্ট মানদণ্ড থাকা।

১৫। রিপোর্টিং-এ সমতাভিত্তিক মূল্যায়ন

- সকল ধরনের শিক্ষার্থীর শেখার অগ্রগতি সমান গুরুত্বে রিপোর্ট করা।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে মূল্যায়িত উত্তরপত্র দেখার সুযোগ দেওয়া।

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে মূল্যায়নে বিভিন্ন কৌশল, উপকরণ এবং মূল্যায়নকারী

মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল	উপকরণ	মূল্যায়নকারী
• সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন • স্ব-মূল্যায়ন • ভূমিকাভিনয়, খেলা, মেলা • কাগজ-কলমনির্ভর পরীক্ষা	রুব্রিক্স (যেমন-শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা নির্ধারণী আচরণ ছক) চেকলিস্ট (যেমন-তথ্য সংগ্রহ বা পর্যবেক্ষণ ছক)	শিক্ষার্থী নিজে সহপাঠী শিক্ষক অভিভাবক

• ওপেন বুক টেস্ট • মৌখিক পরীক্ষা • পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শনী (প্রজেক্ট ওয়ার্ক, দেয়ালপত্রিকা) • উপস্থাপন (নাটক, গান, কবিতা, বিতর্ক, গল্প, বক্তৃতা, জার্নাল) • একক চিন্তা-জোড়ায় আলোচনা- উপস্থাপনা (think-pair-share) • কাগজ-কলমভিত্তিক পরীক্ষা • পোর্টফোলিও মূল্যায়ন • খেলাভিত্তিক মূল্যায়ন • বয়স, অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী সহজ বা চিত্রসহ প্রশ্ন দিয়ে মূল্যায়ন	বই, কাগজ, কলম, ওয়ার্কশিট বা কর্মপত্র	অন্যান্য অংশীজন (এলাকাবাসী, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ)

জেন্ডার সমতা

সমাজে জেন্ডার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। শুরুতে নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যের উপর গুরুত্ব ছিল; পরে সামাজিকীকরণে নারী-পুরুষের ভিন্ন অভিজ্ঞতা আলোচনায় আসে। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী জেন্ডার শুধু জৈবিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, পরিবারের মতো সামাজিক কাঠামোর একটি সংগঠক নীতি। জেন্ডার সমতা বলতে বোঝায় নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গসহ সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার, সুযোগ ও আচরণ নিশ্চিত করা, যেখানে কেউ লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার হয় না এবং সবাই শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। জেন্ডার সমতা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, বঞ্চনা ও স্টেরিওটাইপ দূর করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সবার জন্য ন্যায়সঙ্গত পরিবেশ তৈরি করে। এর লক্ষ্য হলো প্রত্যেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমানভাবে বিকাশ ও অবদান রাখার সুযোগ পায়, যাতে সমাজে ন্যায়বিচার, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার নিয়ে মনোভাবের পরিবর্তন

১৯৮০-এর দশকে পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার বিষয়ক পুরনো ধ্যান ধারণা দূরীকরণ, সহশিক্ষা এবং বৈষম্যবিরোধী উদ্যোগে জোর দেওয়া হয়। ১৯৯০-এর দশকে গুরুত্ব পায় উন্নয়নশীল দেশে নারীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিক্ষেত্রে নারীদের অনগ্রসরতা। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে শিক্ষায় জনসম্পৃক্ততা কমে যাওয়ায় লিঙ্গভিত্তিক সংস্কারগুলো সীমিত ছিল।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ধারণার অগ্রগতি

জেন্ডার সংবেদনশীলতা হলো নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক ও ন্যায্য প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা ও চাহিদাকে সম্মান করা এবং লিঙ্গভিত্তিক কোনো পক্ষপাত বা বঞ্চনা না করে সবার প্রতি সমান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করার দৃষ্টিভঙ্গি। এতে ছেলে বা মেয়ে

কারো প্রতি লিঙ্গের কারণে বাড়তি সুবিধা বা বঞ্চনা দেওয়া হয় না; বরং যোগ্যতা, সক্ষমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সমাজ, কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাঙ্গনে সমতা ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলাই জেন্ডার সংবেদনশীলতার মূল লক্ষ্য।

শ্রেণিকক্ষকে জেন্ডার সংবেশনশীল করার কেন্দ্র হিসেবে দেখা শুরু হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী কথোপকথন, পাঠ্যবিষয়, সহপাঠী সংস্কৃতি সবকিছুই বিশ্লেষণের আওতায় এসেছে। গবেষণায় দেখা যায়, নানা ধরনের পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাজের বণ্টন ও জ্ঞানকে জেন্ডারভিত্তিক করে তোলে। খেলাধুলা, শৃঙ্খলা, ছেলেদের বিষয় ইত্যাদি পুরুষতান্ত্রিকতার প্রধান ক্ষেত্র। ভাষা ও কথোপকথনের ভূমিকা এখন বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়; এতে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা, শিক্ষক মনোভাব ও আচরণ শিক্ষার্থীর পরিচয় গঠনে প্রভাব ফেলে। লিঙ্গ পরিচয় গঠনে জাতি ও শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষকের ভূমিকা ও পক্ষপাত

শিক্ষকেরা প্রায়ই মনে করেন তারা ছেলেমেয়েদের সাথে সমানভাবে আচরণ করেন। বাস্তবে অনেক অচেতন পক্ষপাত থাকে, যা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও শিক্ষাগত অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, বহু দেশে শিক্ষকরা ছেলেদের বেশি মনোযোগ, প্রতিক্রিয়া ও সুযোগ দেন। এতে তারা ক্লাসে আধিপত্য বিস্তার করে, আর মেয়েদের অংশগ্রহণ কমে।

নাইজেরিয়ার একটি বৃহৎ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে ২১টি স্কুলের ৮৬টি শ্রেণিকক্ষের ৪৫% শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল। অর্ধেক ক্লাসে জেন্ডারসমতার প্রচেষ্টাও দেখা গেছে। অধিকাংশ বৈষম্য শিক্ষকদের থেকেই এসেছে। সহশিক্ষা স্কুলে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য অর্থাৎ ছেলেদের সুবিধা বেশি ছিল। মেয়েদের স্কুলে সমতা-উদ্যোগ বেশি এবং ছেলেদের স্কুলে সবচেয়ে কম দেখা গেছে। এই গবেষণার মতে, একই শিক্ষক কখনো বৈষম্য আবার কখনো সমতার বার্তা - দুই রকমই প্রদান করতে পারেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেন্ডার বৈষম্য দূর করার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, কিন্তু এখনো শক্তভাবে রূপান্তরমূলক ভূমিকায় পৌঁছায়নি। দৈনন্দিন শ্রেণিকক্ষের আচরণ, শিক্ষক মনোভাব, সহপাঠী সম্পর্ক, পাঠ্যবস্তু সবই জেন্ডার সমতা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো সচেতনভাবে পরিবর্তন করা গেলে ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি সম্ভব।

শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার বৈষম্য

শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার বৈষম্য বলতে বোঝায় এমন সব আচরণ, মনোভাব, নিয়ম বা চর্চা যা ছেলে, মেয়ে বা তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের প্রতি ভিন্ন ও অন্যায্য ব্যবহার তৈরি করে। এটি অনেক সময় সরাসরি দেখা যায় না, তবে আচরণ, ভাষা, প্রত্যাশা এবং সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পায়। যেমন ছেলেদের গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে বেশি দক্ষ মনে করা, ছেলেদের বেশি ডাকা এবং মেয়েদের “নীরব, বাধ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন” হিসেবে প্রত্যাশা করা।

জেন্ডার সংবেদনশীল শ্রেণিকক্ষ

জেন্ডার সংবেদনশীলতা বলতে বোঝায় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, পক্ষপাত, অসম আচরণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সেগুলো দূর করার মতো আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা। এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গসহ সকল মানুষের প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূলতাকে বিবেচনায় নিয়ে সমান সম্মান, সুযোগ ও আচরণ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার সংবেদনশীলতা হলো শিক্ষার্থী - ছেলে, মেয়ে বা অন্য যেকোনো জেন্ডারের প্রতি সমতা, সম্মান ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রেখে শেখানো। এটি জেন্ডারভিত্তিক পক্ষপাত, বৈষম্য ও স্টেরিওটাইপ চিহ্নিত করে তা দূর করতে সাহায্য করে। সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে; আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব ও শেখার সুযোগ সমানভাবে দিতে এবং

বিদ্বেষ, বুলিং ও জেন্ডার বৈষম্য কমাতে শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার সংবেদনশীলতা জরুরি। একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক শেখার পরিবেশ তৈরি করতে সহযোগিতা করে।

জেন্ডার সমতায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা

জেন্ডার সমতাকে এখন দেখা হয় বহুমাত্রিক, চলমান এবং সামাজিক প্রত্যাশা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসেবে। পরিবার, বিদ্যালয়, গণমাধ্যম, প্রযুক্তি সবকিছুই জেন্ডার সমতা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয় একদিকে সমাজের প্রত্যাশা জোরদার করে, অন্যদিকে পরিবর্তনের সুযোগও সৃষ্টি করতে পারে।

জেন্ডার সংবেদনশীল শিখন-শেখানো কৌশল

১. **সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ:** ছেলেমেয়ে দু'পক্ষকেই সমানভাবে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া। গ্রুপ ও জোড়ায় কাজ করার সময় মিশ্র দল গঠন করা। কেউ বেশি আধিপত্য করছে কি না (বিশেষত ছেলেরা), তা খেয়াল রেখে ভারসাম্য বজায় রাখা।

২. **শিক্ষকের ভাষা ও আচরণে পক্ষপাতমুক্ততা:** 'ছেলে-মেয়েরা' না বলে 'শিক্ষার্থীরা' এর মতো সংবেদনশীল ভাষা ব্যবহার করা। মন্তব্যে স্টেরিওটাইপ থেকে বিরত থাকা (যেমন: "গণিতে ছেলেরাই ভালো" ইত্যাদি)। প্রশংসা এবং সমালোচনা উভয় ক্ষেত্রেই জেন্ডার সংবেদনশীল মনোভাব প্রদর্শন করা।

৩. **শেখার উপকরণে জেন্ডার ন্যায়পরায়ণতা:** পাঠ্যপুস্তক, ছবি বা উদাহরণে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। পেশা-সম্পর্কিত উদাহরণে জেন্ডার বৈচিত্র্য দেখানো (যেমন: নারী প্রকৌশলী, পুরুষ নার্স)।

৪. **শ্রেণিকক্ষের ভূমিকা ও দায়িত্ব বণ্টনে সমতা:** বোর্ড পরিষ্কার, খাতা বিতরণ, গ্রুপ লিডার - সব দায়িত্বে ছেলেমেয়েদের সমান সুযোগ। নেতৃত্বের ভূমিকা রোটেশন পদ্ধতিতে দেওয়া।

৫. **নিরাপদ, সম্মানজনক শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরি:** যেকোনো ধরণের ভাষাগত বা শারীরিক বিদ্বেষ, ঠাট্টা, ট্রলিং, বুলিং - এগুলোতে শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন করা। শিক্ষার্থীদের মতামতকে সম্মান করা, কথা বলতে উৎসাহ দেওয়া - বিশেষত যারা লজ্জাবতী বা আত্মবিশ্বাসহীন।

৬. **শেখার কার্যক্রমে নানা ধরনের প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার:** আলোচনা, রোল-প্লে, ড্রইং, হাতে-কলমে কাজ এসবের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধি করা। মেয়েদের "সহজ কাজ" ও ছেলেদের "কঠিন কাজ" - এই প্রচলিত ধারণা ভাঙতে কার্যক্রমে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা।

৭. **শেখার প্রতিবন্ধকতা ও ভিন্নতা বিবেচনা:** ছেলেমেয়েদের শেখার গতিতে পার্থক্য থাকলে প্রয়োজন অনুসারে সহায়তা বাড়ানো। কোনও আচরণগত পার্থক্যকে জেন্ডার নির্ধারিত ধরা থেকে বিরত থাকা।

৮. **ইতিবাচক রোল-মডেল উপস্থাপন:** নারী-পুরুষ উভয়ের সফলতা ও অবদানের গল্প তুলে ধরা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রীড়া, নেতৃত্ব-সবক্ষেত্রের বৈচিত্র্যময় উদাহরণ ব্যবহার করা।

৯. **সংবেদনশীল আলোচনায় দক্ষ ব্যবস্থাপনা:** জেন্ডার, সম্পর্ক, সহিংসতা, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বয়সোপযোগী আলোচনা করা। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনা ও তাদের ভাবনাকে সম্মান করা।

১০. **প্রতিফলন ও আত্মমূল্যায়ন:** শিক্ষক নিজের আচরণ, প্রশ্ন করা, প্রশংসা করা - এসব বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন কোনো পক্ষপাতমূলক কাজ করছে কিনা। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও ফিডব্যাক নেওয়া যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতে শিক্ষকগণ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট তৈরি করতে পারেন। যেমন: আমি কি প্রশ্ন করতে গিয়ে ছেলেদের বেশি ডাকছি? মেয়েরা কি আলোচনা বা কাজে অংশ নিতে সংকোচ বোধ করছে? আমার ব্যবহৃত উদাহরণ ও ভাষা কি জেন্ডার নিরপেক্ষ? নেতৃত্ব ও দায়িত্বে কি জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের সুযোগ রয়েছে? কোনো লুকায়িত পক্ষপাত কি আমার আচরণে আছে?

জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষকতা শুধু সমতা নয়, এটি শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়বোধ এবং সম্মানবোধ গড়ার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সচেতন অনুশীলন, ভাষা, উপকরণ এবং আচরণ - সব মিলিয়েই একটি ন্যায়ভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ গড়ে ওঠে।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

1. Bialystok, E. (2009). *Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent.* Bilingualism: Language and cognition.
2. Boyle, C., Anderson, J., & Allen, K. A. (2020). *The importance of teacher attitudes to inclusive education.* In Inclusive education: Global issues and controversies. Brill.
3. Evans, G. W. (2004). *The environment of childhood poverty.* American psychologist.
4. Phillips, D. A., & Shonkoff, J. P. (Eds.). (2000). *From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development.*
5. Piaget, J., & Cook, M. (1952). *The origins of intelligence in children* (Vol. 8, No. 5). New York: International universities press.
6. Shonkoff, J. P., Duncan, G. J., Fisher, P. A., Magnuson, K., Raver, C., & Yoshikawa, H. (2011). *Building the brain's "air traffic control" system: How early experiences shape the development of executive function.*
7. Snow, C. E. (2013). *Social perspectives on the emergence of language.* In The emergence of language. Psychology Press.
8. Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. ASCD.
9. Wininger, S. R., Redifer, J. L., Norman, A. D., & Ryle, M. K. (2019). *Prevalence of learning styles in educational psychology and introduction to education textbooks: A content analysis*. Psychology Learning & Teaching.
10. Zhang, H., Yang, J., & Liu, Z. (2024). *Effect of teachers' teaching strategies on students' learning engagement: moderated mediation model*. Frontiers in Psychology.
11. Ainscow, M. (2005). *Developing inclusive education systems: What are the levers for change?* Journal of Educational Change, 6(2), 109–124.
12. United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (UNCRC).* New York: United Nations.
13. UNESCO. (2001). *Inclusive Education: The Way of the Future.* Paris: UNESCO.
14. OECD. (2012). *Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools.* Paris: OECD Publishing.

15. United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights.* New York: United Nations.
16. Filmer, D., Langthaler, M., Stehrer, R., & Vogel, T. (2018). Learning to realize education's promise. *World Development Report. The World Bank*.
17. Chien, C. L., & Huebler, F. (2019). Handbook on measuring equity in education. *FormaMente*, *14*(2).
18. UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. Paris: UNESCO.
19. Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (2014). *Cooperative Learning: Improving University Instruction by Basing Practice on Validated Theory*. Journal on Excellence in College Teaching.
20. Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). *Exploring Inclusive Pedagogy*. British Educational Research Journal.
21. Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners* (2nd ed.). ASCD.
22. WHO & World Bank. (2011). *World Report on Disability*. Geneva: World Health Organization.
23. নেপ (২০২৪), শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ, প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি), নেপ, ময়মনসিংহ
24. https://www.unicef.org/media/73236/file/Inclusive-Education-Guidelines.pdf
25. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259592
26. https://www.who.int/publications/i/item/9789241564182
27. https://udlguidelines.cast.org/
28. একীভূতকরণের কৌশলঃ শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০২১)
29. https://www.unicef.org/rosa/media/2371/file/Inclusive%20Education.pdf
30. Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2005). *Inclusive education: A practical guide to supporting diversity in the classroom*. Psychology Press.
31. Fox, L., & Hemmeter, M. L. (2009). A programwide model for supporting social emotional development and addressing challenging behavior in early childhood settings. In *Handbook of positive behavior support* (pp. 177-202). Boston, MA: Springer US.
32. Byrne, B. (2022). How inclusive is the right to inclusive education? An assessment of the UN convention on the rights of persons with disabilities' concluding observations. *International Journal of Inclusive Education*.
33. De Beco, G. (2014). The right to inclusive education according to Article 24 of the UN Convention on the rights of persons with disabilities: background, requirements and (remaining) questions. *Netherlands Quarterly of Human Rights*.
34. Ydesen, C., Milner, A. L., Aderet-German, T., Caride, E. G., & Ruan, Y. (2022). *Educational Assessment and Inclusive Education*. New York: Palgrave MacMillan.

35. Connell, R. W. (2005). Masculinities (2nd ed.). University of California Press.
36. Francis, B., & Skelton, C. (2005). Reassessing Gender and Achievement. Routledge.
37. Sadker, M., & Sadker, D. (1994). Failing at fairness: How America's schools cheat girls. Scribner.
38. Stromquist, N. P. (2007). Gender policies in education: A comparative review. UNESCO.
39. UNESCO. (2015). Gender and Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges.

অধ্যায় ৬: শিশুর শিখনে অংশীজন ও প্রতিষ্ঠান

শিশুর শিখন কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক দায়িত্ব নয়। এটি পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট নানা অংশীজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল। শিশু পরিবার থেকে প্রাথমিক মূল্যবোধ, ভাষা ও আচরণ শিখে আসে; বিদ্যালয়ে সে কাঠামোবদ্ধ জ্ঞান, দক্ষতা ও সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে; আর সমাজ তার শিখনকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করে অর্থবহ করে তোলে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীল পরিবেশ–শিশুর শিখনে সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

এই অধ্যায়ে শিশুর শিখনে পরিবার, সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা করণীয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে, বৈচিত্র্যময় শিখন চাহিদাসম্পন্ন সকল শিশুর জন্য নিরাপদ, সহায়ক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক/একীভূত শিখন পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের সমন্বিত ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ, ইতিবাচক আচরণ গঠন এবং সমতা ও মর্যাদাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

শিশুর শিখনে পরিবার, সমাজ ও অংশীজন

পরিবার (অভিভাবক) এর করণীয়

- শিশুর সক্ষমতা, আগ্রহ ও সীমাবদ্ধতাকে সম্মান করে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা
- নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা ও পড়ালেখায় সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা
- সন্তানের বিশেষ শিখন চাহিদা, স্বাস্থ্য বা আচরণগত বিষয় শিক্ষককে অবহিত করা
- শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী শিশুর বাড়িতে পড়াশোনায় সাহায্য করা। যেমন-বিদ্যালয়ে কী শিখানো হচ্ছে, শিক্ষক কী পরামর্শ দিচ্ছেন, সে অনুযায়ী বাড়িতে চর্চা করানো ইত্যাদি।
- শিশুর অপ্রত্যাশিত আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করা (যেমন- অন্যের কলম/পেন্সিল না বলে নিয়ে আসা, অন্য শিশুদের আঘাত করা বা ধাক্কা দেওয়া, বড়দের সাথে খারাপ ভাষায় কথা বলা ইত্যাদি)
- বাড়িতে সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বৈচিত্র্য গ্রহণের মূল্যবোধ চর্চা করা
- বিদ্যালয়ের সভা, অভিভাবক সমাবেশ ও একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- বৈষম্য, অবহেলা বা বুলিংয়ের বিরুদ্ধে সচেতন থাকা ও প্রয়োজন হলে প্রতিবাদ করা
- সন্তানের সামাজিক দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও স্বাবলম্বিতা বিকাশে উৎসাহ দেওয়া
- শিশুকে তার প্রতিদিনের কাজগুলো (যেমন-পোশাক পরা, দাঁত ব্রাশ করা, বই-পুস্তক গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি) করতে উৎসাহিত করা
- শিশুকে বিদ্যালয়ে সহপাঠী এবং শিক্ষকগণের সাথে কথা বলতে উৎসাহিত করা
- শিশুকে প্রতিদিন কিছু নতুন শব্দ শিখতে ও বলতে উৎসাহিত করা
- শিশুকে বিভিন্ন কার্যক্রমে (যেমন-রচনা, বক্তৃতা, বিতর্ক, হাতের লেখা, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংক, কুইজ-কুইজ, বিজ্ঞান মেলা, ইংলিশ স্পিকিং, বই পড়া ইত্যাদি) অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা
- শিশুকে ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করতে উৎসাহিত করুন ও প্রয়োজনে সহায়তা করুন। (যেমন- শিশুকে সংখ্যার ধারণা দেওয়া ও গণনা করতে সহায়তা করা-বলতো এখানে কয়টা আম আছে?; শিশুকে রঙ বা আকার অনুযায়ী

খেলনা সাজাতে বলা; দুটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য বা মিল খুঁজতে উৎসাহিত করা; সময়সূচি তৈরি করতে দেওয়া—যেমন, সকালে কখন উঠবে, পড়বে, খেলবে ইত্যাদি; টাকা ও মুদ্রা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করতে বলা

- বছরের শুরুতেই শিশুর বিদ্যালয়ের ছুটির ক্যালেন্ডার সম্পর্কে জেনে নেওয়া

সমাজের করণীয়

- শিশু ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ইতিবাচক সামাজিক মনোভাব তৈরি করা
- বিদ্যালয়-পরিবার-সমাজের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সকল শিশুর অংশগ্রহণে সহায়তা করা
- বৈষম্যমূলক আচরণ রোধে সচেতনতা তৈরি ও সামাজিক নজরদারি
- স্থানীয় সম্পদ (ক্লাব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এনজিও ইত্যাদি) শিশু বিকাশে কাজে লাগানো

স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ এর করণীয়

- বিদ্যালয়ের অবকাঠামো শিশু-বান্ধব ও চলাচল উপযোগী করতে সহায়তা (র‍্যাম্প, নিরাপদ পথ) করা
- প্রয়োজনে সহায়ক উপকরণ (হুইলচেয়ার, ক্রাচ, শিক্ষা উপকরণ) সরবরাহ করা
- বিদ্যালয়ে যাতায়াত ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সহায়তা করা
- একীভূত শিক্ষায় অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সমাধানে ভূমিকা রাখা
- বিদ্যালয়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকা

শিশুর শিখনে প্রতিষ্ঠান

শিক্ষক এর করণীয়

- শিশুর শেখার ধরণ, গতি ও সক্ষমতার ভিন্নতা বুঝে পাঠ পরিকল্পনা করা
- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, কর্মভিত্তিক ও আনন্দময় পাঠদান নিশ্চিত করা
- বুলিং, উপহাস ও নেতিবাচক আচরণ প্রতিরোধ করে সহমর্মিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা
- ভাষা, উপকরণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি শিশুর চাহিদা অনুযায়ী অভিযোজিত করা
- ধৈর্যশীল আচরণ, ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও উৎসাহ প্রদান
- অভিভাবকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও পরামর্শ প্রদান
- শিশু সুরক্ষা, গোপনীয়তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা
- শ্রেণিকক্ষে শিশুর অপ্রত্যাশিত আচরণ বোঝার চেষ্টা করা
- শ্রেণিকক্ষে শিশুর ইতিবাচক আচরণকে উৎসাহিত করা
- শিশুর শিখনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা
- শিশুর শিখন ধরন অনুযায়ী শিখন কৌশল পরিবর্তন করা

প্রধান শিক্ষক এর করণীয়

- বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান
- সকল শিশুর ভর্তি, উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সহায়তা ও তদারকি জোরদার করা
- শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ও বৈষম্যবিরোধী পরিবেশ নিশ্চিত করা
- স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন, সেবা সংস্থা ও অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয়
- নিয়মিত শ্রেণিকার্যক্রম মনিটরিং, মূল্যায়ন ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- শিশু, শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা

বিদ্যালয়ের করণীয়

- ক্যাচমেন্ট এলাকার সকল শিশুর জন্য ভর্তি ও শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা
- সহায়ক শ্রেণিকক্ষ, উপযোগী শিক্ষা উপকরণ ও নিরাপদ অবকাঠামো নিশ্চিত করা
- নিয়মিত শিক্ষক-অভিভাবক সভা, মা-সমাবেশ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজন করা
- সকল শিশুদের জন্য সমান সুযোগ, অংশগ্রহণ ও মর্যাদা নিশ্চিত করা
- সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে সকল শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- শিশুদের বিকাশ, সুরক্ষা ও অধিকার বিষয়ে ধারাবাহিক সচেতনতা সৃষ্টি করা
- বৈষম্য, শারীরিক বা মানসিক শাস্তিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা

প্রেক্ষাপট (শিশুর শিখনে অংশীজন ও প্রতিষ্ঠান)

জাকারিয়া একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে সাধারণত স্কুলের গণিত ও ইংরেজি শিখনে কিছুটা ধীরগতি সম্পন্ন। কখনও কখনও ক্লাসে মনোযোগ ধরে রাখতে পারেনা এবং সহপাঠীর সঙ্গে খারাপ আচরণও করে ফেলে। তার বাবা-মা লক্ষ্য করেন যে, শুধুমাত্র স্কুলের পড়া এবং বাড়িতে স্বাভাবিক পড়াশুনা ও দেখাশুনা করে তার শিখন সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। তাই পরিবার, বিদ্যালয় এবং স্থানীয় সমাজ মিলিতভাবে জাকারিয়ার শিখনমান উন্নত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে জাকারিয়ার পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও স্থানীয়রা নিম্নোক্তভাবে জাকারিয়ার সাহায্যে অংশগ্রহণ করে:

পরিবারের অংশগ্রহণ:

- জাকারিয়ার মা-বাবা তার দৈনন্দিন পড়াশুনায় গুরুত্বের সাথে সাহায্য করে।
- তারা স্কুলে শেখানো বিষয়গুলোর সঙ্গে বাড়িতে ছোট ছোট কার্যক্রম করে তাকে শেখান। যেমন, সংখ্যা ও রঙ চর্চা, ছোট সমস্যা সমাধান।
- তারা জাকারিয়ার সামাজিক আচরণ উন্নয়নেও সহায়তা করেন, যেমন: বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করা শেখান , ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ:

- শিক্ষক জাকারিয়ার শেখার ধরন ও গতিকে বুঝে তাকে বিশেষ সহায়তা দেয়।

- শিক্ষক ক্লাসে শিশু-কেন্দ্রিক ও আনন্দময় পাঠদান নিশ্চিত করে।
- বিদ্যালয় প্রতিটি শিশুর ইতিবাচক আচরণকে উৎসাহিত করে এবং বুলিং প্রতিরোধ করে।
- প্রধান শিক্ষক সকল অভিভাবক, জাকারিয়ার অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় বৈঠক করেন।

সমাজ ও স্থানীয় অংশগ্রহণ:

- স্থানীয় পাঠাগার ও ক্লাব জাকারিয়ার জন্য অতিরিক্ত শিখন কার্যক্রমের সুযোগ দেয়।
- প্রতিবেশীরা স্কুলে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
- স্থানীয় এনজিও জাকারিয়ার বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষামূলক উপকরণ সরবরাহ করে।

ফলাফল:

- জাকারিয়ার শেখার গতি বৃদ্ধি পায় এবং সে নিজেকে আরও আত্মবিশ্বাসী মনে করে।
- সামাজিক দক্ষতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ উন্নত হয়।
- বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের সমন্বিত প্রচেষ্টার কারণে জাকারিয়ার শিখন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও অর্থবহ হয়।

কেস স্টাডি

মেহের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। সে সাধারণত চঞ্চল এবং অনেকবার ক্লাসে মনোযোগ হারায়। কখনও কখনও সে সহপাঠীদের কথা না শুনে তার নিজের মতো করে কাজ করে। শিক্ষকের নির্দেশনা মানতে অনিচ্ছুক থাকে এবং মাঝে মাঝে অন্যদের পরাশুনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

- **পরিবারের প্রেক্ষাপট:**
  মেহেরের পরিবার অনেক ব্যস্ত, তাই তার পড়াশোনা এবং আচরণ পর্যবেক্ষণে সময় দিতে পারছে না। বাড়িতে মাঝে মাঝে পরিবারের সদস্যরা তার সঙ্গে খেলাধুলা ও পড়াশুনার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু নিয়মিত নয়।
- **বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপট:**
  শিক্ষকরা মেহেরকে ক্লাসে মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। তারা বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, যেমন- গ্রুপ কার্যক্রম, গল্প বলা, ছবি আঁকা ও ছোট ছোট পরীক্ষা। কিন্তু মেহের মাঝে মাঝে অন্যদের উপর বিরক্তিকর আচরণ দেখায় এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা অনুভব করে।
- **সমাজ ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট:**
  মেহেরের স্থানীয় কমিউনিটি বা স্কুলের আশেপাশের সমাজের অংশগ্রহণ সীমিত। কখনও কখনও স্থানীয় ক্লাব বা পাঠাগারে মেহের অংশগ্রহণ করে, কিন্তু নিয়মিত নয়।

মেহেরের সহায়তায় আমাদের করণীয় কী?

শিশুর শিখন কার্যকর করতে পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজের সমন্বিত অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি অংশীজন শিশুর সক্ষমতা, আগ্রহ ও আচরণ অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করলে শিখন আরও অর্থবহ ও আনন্দময় হয়। পরিবার শিশুর দৈনন্দিন চর্চা ও সামাজিক আচরণে সহায়তা করে, বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম ও ইতিবাচক পরিবেশ নিশ্চিত করে,

আর সমাজ নিরাপদ পরিবেশ ও অতিরিক্ত শিখন কার্যক্রমে সমর্থন প্রদান করে। সমন্বিত প্রচেষ্টা শিশুর আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দক্ষতা ও শিখনফল বৃদ্ধিতে কার্যকর।

রেফারেন্স

1. Mondal, N. B., Gain, N., & Sarker, B. K. (2025). *Impact of parental involvement, classroom climate, and behavior problems on academic achievement of children between rural and urban areas of Bangladesh*. *Journal of Pedagogy and Education Science, 4(2), 170–185*.
2. Muhammad, Y., Waqar, Y., & Anis, F. (2024). *Parental and community involvement in promoting inclusive education: A focus on Pakistan*. *Global Sociological Review, IX(1), 64–76.*